উত্তম পুরুষ

তুলি-কলম

৫৭-এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৬৬
ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
৫৭-এ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক
মনোজকুমার দত্ত
সাক্ষর মুদ্রণী
৪ মধুপাল লেন
কলকাতা-৫

প্রচ্ছদ শিল্পী
সুব্রত দত্ত

তিন টাকা

খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও নাট্যকার

ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্ত

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের অন্য উপন্যাস

তপতী কন্যা

বাসর

সুধা পারাবার (যন্ত্রস্থ)

'মনে হলো যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে।
দূর হতে আমি দেখেছি তোমার ওই বাতায়ন তলে
নিশীথে প্রদীপ জ্বলে,
আমার এ-আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে।'

রাত চারটে।

শীতের রাতে গলিটার বুকে ছড়িয়ে আছে তুহিন-শীতল স্তব্ধতা।

নাইট ডিউটি।

কিছুক্ষণ আগে আপিস থেকে ফিরেছি।

কেন জানি না, কিছুতেই ঘুম আসছে না চোখে।

অগত্যা বসে বসে দিন-পঞ্জীর পাতায় কালির আঁচড় টানলাম কিছুক্ষণ।

এক সময়ে উঠে যেয়ে জানালাটা খুলে দিলাম।

বাইরে ছবির মত ঝকঝকে আকাশ।

এক কোণে জ্বল্ জ্বল্ করছে শুকতারা।

আশ্চর্য একটা নীলাভ দ্যুতি ঠিক্‌রে পড়ছে তার গা থেকে।

যেন কার নীল নয়নের ইসারা।

আকাশে শুকতারা দেখলেই আমার সাগরকে মনে পড়ে।

অমনি স্পষ্ট তার চেহারা। সারা মুখে অমনি সজল প্রশান্তি। অমনি তীব্র অগ্নিজ্বালা।

সাগর।

সমুদ্র কৃষ্ণ সেন।

রেকর্ড মার্ক পাওয়া স্কলার।

ব্রাইটেস্ট ষ্টার। উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।

আমার প্রিয়তম বন্ধু।

অনেক বিস্মৃত স্মৃতির মিছিল চোখের সামনে ভীড় করে আসছে।

প্রথম-দিনে-দেখা সাগরের প্রদীপ্ত মুখের কথা মনে পড়ছে।

ঠোঁটে হাসি। চোখে ভালবাসা।

বলেছিলো : আমি সাগর—শ্রীসমুদ্র কৃষ্ণ সেন।

মনে পড়ছে—প্রাণতোষবাবুর ক্লাসে সাগর রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেছিলো।

কণ্ঠে সমুদ্রের গর্জন। চোখে দূর আকাশের স্বপ্ন।

বিস্ময়বিমুগ্ধ শৈলেশবাবু সাগরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর বড় আদরের কোটেশনের খাতা।

বেশ মনে পড়ে, সাগরের ভাগ্যকে সেদিন ঈর্ষা করেছিলাম।

কিন্তু পরবর্তী কালে আবার একদিন মনে হয়েছিলো, কত বড় মন্দ ভাগ্য নিয়েই না সাগর এই পৃথিবীতে এসেছে।

মনে হয়েছিলো, না-পাওয়ার বেদনা তবু সয়, কিন্তু পেয়ে হারানোর বেদনা যে অসহ্য।

অথচ সেই সহ্যাতীত বেদনাই বুঝি সাগরের ভাগ্যলিপি।

নইলে যে প্রাণতোষবাবু ওকে এত ভালবাসলেন, সংসারে সর্বহারা সাগর বাবা বলে ডেকে যাঁর পায়ে আশ্রয় নিলো, সেই প্রাণতোষবাবুরই কাঠের খড়মজোড়ার উপর শেষ প্রণাম নিবেদন করে কেন সাগর একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো ?

আর মিঃ সদাশিব মুখার্জি ?

তাঁর গৃহিণী মিসেস্ মুখার্জি ?

সকলের উপরে তাঁদের একমাত্র কন্যা লাবণ্য, আদর করে সাগর যার নাম রেখেছিলো বন্যা ?

সবাই তো দুই হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়েছিলো।

ওর মাথায় ঢেলে দিয়েছিলো স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার অমিয় নির্ঝর।

তবু কেন একদিন তীরবিদ্ধ কিশোর হরিণের মত সাগরকে ছুটে যেতে হলো জীবনের মরুপথে ?

তাই তো সাগরকে দেখে সেদিন মনে হয়েছিলো : সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্।

জীবনে সুখ নেই, শান্তি নেই, আনন্দ নেই, উৎসব নেই। শুধু দুঃখ। শুধু ব্যর্থতা।

ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের উদ্ধত আঘাত নিয়ে দুঃখের উত্তাল সমুদ্র আছড়ে পড়ে জীবনের বেলাভূমে। জীবন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়।

সেদিন তাই মনে হয়েছিলো।

কিন্তু আজ ভাবি, জীবনটা সুখও নয়, দুঃখও নয়। জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণও নয়, আবার কণ্টকে আকীর্ণও নয়। সুখে ও দুঃখে, আনন্দে ও বেদনায়, আঘাতে ও আশ্বাসে এক নিরবচ্ছিন্ন এগিয়ে চলাই জীবন।

অন্ততঃ সাগরের জীবন আমাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছে।

নইলে যক্ষারোগগ্রস্ত সাগর যেদিন একটা ছেঁড়া হাফশার্ট মাত্র পরে সারা রাত কাটিয়েছিলো আমার বাড়ির খোলা রকে, সেদিন তো বার বারই মনে হয়েছিলো, ওর জীবন-বিহঙ্গের পথ চলা বুঝি শেষ হলো এবার।

আর লাবণ্য ?

রক্তাক্ত হৃদয়ের গূঢ়তম বাসনাকে দুই নির্মম হাতে চেপে ধরে যেদিন সে বেলা বাগানের বাসা থেকে সাগরকে একান্ত রিক্ত হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছিলো, সেদিন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলো যে আমার কালকাতার বাসার ছাতে বসে তার কণ্ঠেও এক দিন গানের ঝর্ণা নেমে আসবে ?

অথচ তাই হয়।

জীবনের স্বরূপই তাই।

কখনো চাঁদ হাসে। কখনো বা মেঘে মেঘে কালো হয়ে যায় জীবনের আকাশ।

কখনো সূর্য ওঠে। কখনো ঝড়ের হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে দারুণ অভিশাপের মত।

উৎসুখ দুই আঁখি মেলে জীবন-বিহঙ্গ তবু এগিয়েই চলে।

এক দুর্বার যতিহীন গতিই জীবন।

॥ ১ ॥

সাগরের সাথে আমার প্রথম পরিচয় মফঃস্বলের একটি ছোট শহরে।

সেদিনের কথা আজো স্পষ্ট মনে আছে। গ্রামের বোর্ড স্কুল হতে পাশ করে সেদিনই এসেছি শহরের স্কুলে ভর্তি হতে। বুক দুর্ দুর্ করছে। কত স্বপ্ন। কত আশংকা। হাই-স্কুলটা কি জিনিষ? সেখানকার ছাত্রেরা সব কেমনধারা? মাস্টার মশাইরাই বা কেমন?

নানা দুর্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হলাম স্কুলে। সামনে প্রকাণ্ড পুকুর। নাম 'প্রশান্ত সাগর'। পৌষের শিরশিরে বাতাসে ঢেউ উঠেছে তার বুকে। তারই কোল ঘেঁসে স্কুলের মস্ত লাল বাড়ি। কি ভালোই যে সেদিন লেগেছিল বাড়িটা দেখে। পড়তে হয়তো এই স্কুলেই পড়া উচিৎ। কেমন সারি সারি সব থাম। কতো দরজা-জানালা। আর কতো ছাত্র। সারা বাড়িটা গম-গম করছে।

মনে বড় ভয় ছিলো এত বড় স্কুলে কি আমাকে ভর্তি করবে? আমি যে কিছুই জানি না। ইংরেজী তো একেবারেই না। যদি মস্ত বড় একটা ট্র্যানশ্লেশন ধরে বসেন হেড-মাস্টার মশায়?

আসলে কিন্তু সে সব কিছুই ঘটলো না। হেড-মাস্টার মশায় সোজা ইংরেজীতে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার নাম কি? কোন্ ক্লাসে ভর্তি হতে চাও? ভয়ে ভয়ে জবাব দিলাম। তারপর কাগজ আর পেন্সিল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার বললেন ইংরেজীতে, তোমার যা খুশি এখানে লেখো ইংরেজীতে। বেশ মনে পড়ে, কাঁপা আঙুল ঘুরিয়ে সেদিন লিখেছিলাম—'ডু অর ডাই।' কথাটা আমার হস্তলিপি খাতায় অনেকদিন লিখেছি।

ব্যস্। এই পর্যন্তই। মৃদু হেসে হেড-মাস্টার মশায় বাবার সঙ্গে ভর্তি সংক্রান্ত আলাপ সুরু করলেন।

স্কুলের পিছনে ছোট একটুকরো মাঠ। তারপর রেল রাস্তা। দুপুরের রোদে লাইনটা ঝিল্‌মিল্ করছে। ভারি ভাল লাগলো দেখতে। মরীচিকা কি ওই রকম দেখতে! এই রেল-রাস্তা ধরে কত দূর যাওয়া যায়? ময়মনসিংহ? ঢাকা? কলকাতা? বর্ধমান? দিল্লী? লাহোর? সীমান্ত প্রদেশ?

হেড-মাস্টার মশায়ের ডাকে চমক ভাঙলো। আমাকে কাছে ডেকে সস্নেহে বললেন, ক্লাস ফোরেই তোমাকে ভর্তি করে নিলাম। এখন ফোর্থ পিরিয়ডের ক্লাস হচ্ছে। আজ থেকে ক্লাসে জয়েন করো গে। ছেলেদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে,কালকের ক্লাসের পড়াও জেনে নিতে পারবে।

বাবা ও হেড-মাস্টার মশায়কে প্রণাম করলাম। তারপর দপ্তরীর সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলাম ক্লাসে। ক্লাস-টিচার হরিহরবাবু চশমাটা নাকের ডগার উপরে টেনে নামিয়ে ট্র্যান্‌শ্লেশন করাচ্ছিলেন। তাঁর নির্দেশ মতো সামনের বেঞ্চিতে যেয়ে বসলাম। আমার বুক তখন ঢিপ ঢিপ করছে।

ঘণ্টা শেষ হয়ে গেলো। হরিহরবাবু চলে গেলেন। আমি যেন গরম কড়াই হতে আগুনের কুণ্ডে পড়লাম। চারদিক থেকে এক-পাল ছেলে এসে রকমারি প্রশ্ন ও হাসি-ঠাট্টায় আমাকে অস্থির করে তুললো। দু' একটা জবাব দিয়েই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। চুপ করে বসে রইলাম মাথা নিচু করে।

এ-বিপদ হতে সেদিন যে আমাকে উদ্ধার করেছিলো সে সাগর। পরিচিত বন্ধুর মতো সাগর আমার পাশে এসে বসলো। দরদী গলায় শুধালো, তোমার নাম কি ভাই?

কে জানে কি ছিলো সে কণ্ঠস্বরে। এক মুহূর্তে মনে হলো, পেয়েছি পরমাত্মীয়। মাথা তুলে বললাম, তরুণ—শ্রীতরুণ কুমার রায়।

ঠিক আমার ভঙ্গী নকল করে সাগর বললো, আমি সাগর—শ্রীসমুদ্র কৃষ্ণ সেন।

ওর বলার ভঙ্গীতে আমার হাসি পেলো। বললাম, সাগর—চমৎকার নাম।

হেসে ও জবাব দিলো, তা বটে, কিন্তু তরুণ চমৎকারতর।

আবার হেসে উঠলাম। সাগর মুখের উপর তর্জনী তুলে বললো, চুপ। সখারামবাবু আসছেন। বড় কড়া মাস্টার।

সখারামবাবু নানারূপ শাস্তি-বিধানের ভিতর দিয়ে ভূগোল পড়িয়ে চলে গেলেন। আমরাও মুক্তি পেলাম স্কুলের ভৌগোলিক গণ্ডীর বাইরে।

প্রথম দিনের পরিচয় ক্রমে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হলো।

আমার মতো সাগরও শহরের স্কুলে নবাগত। আমার চেয়ে দিন পনেরো আগে এখানে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই স্কুলের মধ্যে ওর নাম ছড়িয়ে পড়লো। যেমন মাস্টার মশায়দের মুখে মুখে তেমনি ছেলেদেরও মুখে মুখে।

অদ্ভুত প্রতিভাবান ছেলে। প্রাইমারীতে স্কলার। রেকর্ড মার্ক পেয়ে ফার্ষ্ট হয়ে এসেছে। সত্যি, ফার্ষ্ট হবার মতো ছেলে বটে। স্কুলের প্রতিটি ঘণ্টায় ও বুঝিয়ে দেয় যে ও রেকর্ড-মার্ক পাওয়া ছেলে। কোন প্রশ্নের উত্তর ওর ঠোঁটে আটকায় না। কোন কঠিন অংক ওর হাতকে ফাঁকি দিতে পারে না। বাংলার মাস্টার প্রাণতোষবাবু তো সাগর বলতে অজ্ঞান।

কিন্তু কি যে গ্রহের ফের, এত গুণ সত্ত্বেও সখারামবাবুর কুনজর পড়লো ওর মাথায়। কারণও ছিল। সখারামবাবু ক্লাস সিক্স্ পর্যন্ত ড্রয়িং শেখান আর ক্লাস ফোরে ভূগোল পড়ান। ওই ভূগোলই বাধালো যত গোল। বইয়ের পড়া যেমন তেমন ম্যাপ আঁকতে বললেই সাগরের হাত অচল। আর ড্রয়িং? সাগর একদিন আঁকলো একটা

গোলাপ ফুল বহু সাধ্যসাধনা করে। কিন্তু সবাই সে-ছবি দেখে বললো, হ্যাঁ ফড়িংটা হয়েছে মন্দ নয়। তবে পাখাটা—

একটানে সে ফড়িং মার্কা গোলাপের ছবি ও ছিঁড়ে ফেললো।

কিন্তু এরও একটু ইতিহাস আছে।

ম্যাপ আঁকতে, ড্রয়িং করতে সাগর ভাল পারে না তা ঠিক। কিন্তু ওর ভূগোল-ড্রয়িং-ম্যাপ-বৈরাগ্যের কারণ শুধুই ওর অক্ষমতা নয়! আরো কিছু।

সপ্তাহে একদিন ড্রয়িং-এর ক্লাস। প্রথম যেদিন সাগর স্কুলে ভর্তি হলো, তার পরদিনই ছিলো ড্রয়িং। সখারামবাবু একে একে ছেলেদের ড্রয়িং খাতা দেখতে দেখতে সাগরকে শুধালেন, তোমার খাতা?

সাগর উত্তর দিলো, সবে মাত্র কাল ভর্তি হয়েছি স্যার—

অকারণেই সখারামবাবু টিপ্পনি কেটে বললেন, পড়াশুনো কিছু কিছু করো হে বাপু। এ-ভাবে দিন যাবে না। বলে—কত স্কলার দেখলাম,—হুঁঃ।

এক মুহূর্তে সাগরের মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠলো। একি অকারণ তিরস্কার!

পরের সপ্তাহেও সাগর ড্রয়িং আঁকলো না। ড্রয়িং-এর খাতাই গাঁথলো না রাগ করে।

সখারামবাবু শুধালেন, তোমার ড্রয়িং এনেছ?

—না স্যার, খাতা গাঁথা হয় নি।

জ্বলে উঠলেন সখারামবাবু, খাতা গাঁথা হয় নি! এসো এদিকে, খাতা গাঁথিয়ে দিচ্ছি। স্কলারশিপ পেয়ে দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না—না? এসো এদিকে।

কাছে যেয়ে দাঁড়াতেই বা হাতে কানের নতি ধরে ঠাস্ ঠাস্ করে দু' গালে দুই চড় দিলেন কসিয়ে। বিকৃত গলায় বললেন, গো অ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ।

মুখ নিচু করে সাগর তা'র সিটে এসে দাঁড়ালো। সখারামবাবু চেয়ার থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ।

সাগর বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়ালো। ওর শরীর তখন কাঁপছে ঝড়ের পাতার মতো।

সেদিন থেকেই সাগরের মাথায় ঢুকলো সখারামবাবু-ফোবিয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে সখারামবাবুর সাব্‌জেক্ট বলে ভূগোল ও ড্রয়িং-এর উপরেও হলো ওর জাতক্রোধ। শুধু সখারামবাবুর মুখের ঝাঁজ আর হাতের চড় এড়াবার জন্যে যেটুকু পড়া দরকার তাই করে। তার বেশি একটুও না। ড্রয়িং-এর দিন ড্রয়িং এঁকে আনবে ঠিক। কিন্তু ওই—ফড়িং মার্কা গোলাপ ফুল। এঁকে আনবে উত্তর আমেরিকার ম্যাপ। কিন্তু সে-ম্যাপকে যে কোন দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের ম্যাপ বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া চলে।

সাগরের এ-সব দুষ্টুমী-ভরা কাজে সখারামবাবু মনে মনে খুব চটে যান। বলেন, এটা কি এঁকেছ তোমার মাথা?

সাগর হাসি লুকিয়ে গম্ভীর মুখে জবাব দেয়, কাল সারা সন্ধ্যেটা কত যে চেষ্টা করলাম স্যার, কিন্তু কিছুতেই বাগ মানাতে পারলাম না। উত্তর আমেরিকার ম্যাপটাই এমন বিদ্‌ঘুট্টি—

সখারামবাবু ঝংকার দিয়ে উঠলেন, তোমার মাথা। তুমি ভারী ফাঁকিবাজ হয়ে উঠছ দিন দিন। দেখতো সুশীল কেমন চমৎকার এঁকেছে ম্যাপটা।

সুশীল সখারামবাবুর প্রিয় ছাত্র। গত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে প্রমোশন পেয়েছে। ড্রয়িং-এর হাতটা ওর ভালোই।

সখারামবাবু প্রথম বেঞ্চির সুশীলের দিকে তাকিয়ে বললেন গর্বের সুরে, কইরে সুশীল, আন্‌ তো তোর উত্তর আমেরিকার ম্যাপটা।

খাতা নিয়ে সুশীল সগর্বে উঠে এলো। স্কুলে সাগরের আবির্ভাবকে সুশীল ভালো মনে গ্রহণ করতে পারে নি। মাস্টার মশায়দের

কাছে এর মধ্যেই ওর আদর কমে গেছে। আসছে পরীক্ষায় পরাজয়ের আশংকা তো ষোল আনাই বর্তমান। পরীক্ষা-সংগ্রামের বীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে একটা জুতসই আঘাত হানবার এই সুযোগ পেয়ে সুশীল উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

সুশীলের খাতা টেবিলের উপর মেলে ধরে সখারামবাবু বললেন, দেখেছ, কী সুন্দর ম্যাপ ও এঁকেছে। খালি স্কলারশিপ পেলেই হয় না বাপুহে, ভাল ছাত্র হতে হলে সাধনার প্রয়োজন, শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।

পাল্টা আক্রমণের এমন সুযোগ ছাড়বার ছেলে সাগর নয়। চটপট ও কথা বললো, সুশীলের কথা ছেড়ে দিন স্যার, ও হলো ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়—ভাল ছেলে—

ক্লাশ শুদ্ধ ব্যাংগ-ভরা চোখ পড়লো সুশীলের উপর। ওর মুখখানি অজানা আশংকায় কালো হয়ে উঠলো।

সখারামবাবু টিপ্পনি কাটলেন, ওই তো তোমার দোষ। ভাল কথা বললাম, আর অমনি গুমর বাড়লো। আরে বাপু, আগে পরীক্ষা একটা হয়েই যাক, তারপর বুঝব কে ভাল ছেলে আর কে মন্দ। আগে থেকেই তার জন্যে অত গুমর কেন? বলে—কত স্কলারশিপই তো পার হয়ে গেলো এ হাত দিয়ে। এখন দেখা যাক—এ ডিম ফেটে কোন্ মহাপুরুষ বের হন—হস্তি না হয়।

সুশীল ও তার উপদল হো-হো করে হেসে উঠলো। রাগে সাগরের মুখ লাল হয়ে উঠলো। টেবিল থেকে ম্যাপের খাতাখানা নিয়ে ও চলে এলো নিজের সিটে।

সখারামবাবু আবার দু' একটা মন্তব্য করে হাসি মুখে পড়াতে আরম্ভ করলেন। সাগর গুম হয়ে বসে রইলো।

অন্যান্য ক্লাসে কিন্তু সাগর রঙিন হয়ে ওঠে প্রতিভার অরুণ আলোয়। অংকের ঘণ্টায় ওর হাত চলে বিদ্যুতের গতিতে। ইংরেজী

আর ইতিহাসের ঘণ্টায় পাতার পর পাতা ও অনর্গল মুখস্থ বলে যায়। পার্সিং আর কন্‌জুগেশনে ওর দখল দেখে ক্লাস-টিচার হরিহরবাবু মুগ্ধ। প্রথম কয়েকদিন ক্লাস করেই এখন তিনি বোর্ডে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। প্রয়োজন হলে মৃদু হেসে বলেন: সাগর, লিখে দাও তো বোর্ডে সুইম ভার্ব-এর পাষ্ট পারফেক্ট কন্‌টিনিউয়াস টেন্স-এর রূপ।

সাগর সানন্দে বোর্ডে যায়। চক্‌টা হাতে নিয়ে চোখ বুঁজে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়ায়। তারপর মোটা মোটা অক্ষরে নির্ভুল লিখে যায় সবগুলি রূপ।

এমনি করেই পড়া চলে।

আর প্রাণতোষবাবুর বাংলা ক্লাস? সেখানে তো সাগর ছোটখাট দেবতা বিশেষ।

ক্লাসে ঢুকেই একদিন প্রাণতোষবাবু প্রশ্ন করলেন, সবাই মুখস্থ করে এসেছ আজকের পড়া?

পড়ুয়া ছেলেরা কলরব করে উত্তর দিলো, হ্যাঁ স্যার—হ্যাঁ স্যার।

—বেশ—বেশ। বলো তো তুমি?

একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করলো একটি কবিতা আবৃত্তি। তিন লাইন বলেই তার খেই হারিয়ে গেলো। সে প্রথম হতে শুরু করলো আবার।

তাকে বসিয়ে দিয়ে আর একটি ছেলেকে দিলেন ভার। তার আবৃত্তি আরো খারাপ। মনে হয়, লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ছে। অতএব তাকেও বসতে হলো।

প্রাণতোষবাবু বললেন, কে পারো কবিতাটি নির্ভুল আবৃত্তি করতে?

সাগর তবু নীরব। সে জানে, তার সময় এখনো আসে নি। উঠে দাঁড়ালো সুশীল। সুরু করলো কবিতা আবৃত্তি। শেষও হলো।

—আর কে পারো এর চেয়েও ভালো আবৃত্তি করতে?

আগাগোড়া আবৃত্তি করতে পারে অনেকেই, কিন্তু সুশীলের চেয়ে সেটা ভাল হবেই, এত জোর কারো বুকে নেই। ক্লাস স্তব্ধ।

ক্লাসের এপাশ-ওপাশ চোখ বুলিয়ে প্রাণতোষবাবু মৃদু হেসে বললেন, সাগর, তুমি পারো না?

সাগর জবাব দিলো, আবৃত্তি করতে পারি স্যার। কিন্তু সুশীলের চেয়ে ভালো হয়তো হবে না।

মনে মনে খুশি হলেন প্রাণতোষবাবু। বললেন, আচ্ছা, আবৃত্তি করো তো বেশ ভালো করে।

সাগর আবৃত্তি করলো। স্পষ্ট উচ্চারণ, সুরেলা বচনভঙ্গী ও দরদী কণ্ঠস্বর এক সঙ্গে মিশেছে ওর গলায়। আবৃত্তি চমৎকার, ক্লাস নীরব।

একটু পরে প্রাণতোষবাবু সুশীলকে সুধালেন, বলতো সুশীল, কার আবৃত্তি ভাল হয়েছে?

সুশীল আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দিলো, কি জানি স্যার, আমি তত বুঝতে পারি না।

ক্লাসের দিকে তাকিয়ে তিনি একই প্রশ্ন করলেন। ছাত্ররা এক-বাক্যে সাগরের আবৃত্তির প্রশংসা করলো।

সুশীলের দিকে চেয়ে শান্ত অথচ অভিযোগের স্বরে প্রাণতোষবাবু বললেন, তোমরা সবাই জানো,—তুমিও জানো, সাগরও জানে,—বাংলা কবিতা সাগরের মতো আবৃত্তি করতে কেউ পারো না। এমন কি আমিও না। আমার গলায় ওর মতো গান ঝংকৃত হয়ে ওঠে না। আর আবৃত্তিই কবিতার অর্থ বুঝবার প্রধানতম উপায়। আবৃত্তির সুরের সাথে কবিতার অর্থ আপনি এসে ধরা দেয়। তাই সাগরকে দিয়ে রোজ কবিতা আবৃত্তি করিয়ে তারপর আমি সেটা পড়াই।

প্রাণতোষবাবু থামলেন। একটা নিশ্বাস ফেলে আবার বললেন, অথচ এই নিয়ে তোমাদের কারো কারো মনে ধারণা জন্মেছে যে

সাগরকে আমি বেশী ভালোবাসি, তোমাদের দেখতে পারি না। এমন কি কেউ কেউ স্পষ্ট অভিযোগ জানিয়েছে অন্যান্য শিক্ষকের কাছে যে আমি অত্যন্ত পার্শিয়াল। ক্লাসে সাগরকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি, তাদের দিকে ফিরেও চাই না।

একটু থেমে আবার বললেন, অবশ্য আমাকে তোমরা কে কি বললে না বললে, তাতে আমার ক্ষতি কিছু হবে না। কিন্তু এই কিশোর বয়সেই তোমাদের মনে যদি এই সব কুধারণা স্থান পেতে আরম্ভ করে, শিক্ষকদের সম্পর্কে এরূপ হীন ধারণা যদি তোমাদের মনে জাগে, তাহলে যে তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন হবে ভয়াবহ। শিক্ষার পরিবর্তে আমাদের কাছে তোমরা যে শুধু কুশিক্ষাই পাবে। ফলে তোমাদের বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজনের দীর্ঘ নিশ্বাসে যে আমাদের জীবনও দুঃসহ হয়ে উঠবে।

প্রাণতোষবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর বেদনায় স্তিমিত হয়ে এলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি চুপ করলেন।

ছেলেরা স্তব্ধ হতবাক। স্নেহশীল এই বৃদ্ধ শিক্ষকটিকে সকলেই ভালবাসে, ভক্তি করে। ছেলেদের রোগে-শোকে, আপদে-বিপদে সকলের আগেই এগিয়ে আসে এই বৃদ্ধ শিক্ষকের সৌম্য মুখখানি। তাঁর মুখের এই উচ্ছ্বাসভরা কথায় সবারই মন ভারী হয়ে উঠলো।

প্রথম বেঞ্চিতে বসে সুশীল সেই যে কখন মাথা নিচু করেছিলো, সারাক্ষণ একবারও তা তোলে নি। হীন প্রতিযোগিতার প্রেরণায় ঈর্ষার যে বিষ সবেমাত্র ওর কিশোর মনে বাসা বাঁধছিলো, স্নেহশীল মানুষটির দরদী বাণীর স্পর্শে তা বুঝি অমৃত হয়ে ওকে নব জীবন দিয়েছে। ওর দুই চোখ ভরে নেমেছে অনুশোচনার অশ্রুজল।

সস্নেহকণ্ঠে বললেন প্রাণতোষবাবু, কেঁদো না সুশীল, কেঁদো না। তোমরা ছেলেমানুষ। আকাশের মতো নির্মল নীল তোমাদের মন। এ সব ছোটখাটো দোষ-ত্রুটির জন্য দায়ী তোমরা তো নও। এ দোষ

আমাদের। আমরাই তোমাদের কিশোর মনকে গড়ে তোলবার ঠিক মন্ত্রটি জানি না। তাই এ সব ঘটে।

সুশীল তবু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই লাগলো। প্রাণতোষবাবু ওর কাছে যেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ছিঃ, অমন করে কি কাঁদতে আছে পাগল। চোখ মুছে ফেলো। শোনো মন দিয়ে একটা নতুন কবিতা আজ তোমাদের পড়ে শোনাই।

সবাই সচকিত হয়ে বসলো। প্রাণতোষবাবুর কবিতা-পড়া সকলের কানেই মধু ঢেলে দেয়। প্রাণতোষবাবু পড়তে লাগলেন হাতের 'নৈবেদ্য' খুলে।

আর এক দিন পরিচয় পেলাম সাগরের অনন্যসাধারণ স্মৃতি শক্তির।

আশ্চর্য! সরস্বতী কি বাস করে ওর কণ্ঠে? ও কি শ্রুতিধর!

শৈলেশবাবু সদ্য বি. এ. পাশ করে স্কুলে ঢুকেছেন। ক্লাস ফাইভ থেকে এইট্ পর্যন্ত তিনি ইংরেজি পড়ান। ভালো ইংরেজির মাস্টার বলে এর মধ্যেই বেশ নাম কিনেছেন।

সব ক্লাসেই তিনি বলেন, দেখো হে, ইংরেজি যদি শিখতে চাও তাহলে ভাল ইংরেজি মুখস্থ করো। রোজ সকালে দুই প্যারা করে চোস্ত ইংরেজি মুখস্থ করে ফেলো। দেখবে ছ'মাসের মধ্যে তোমার ইংরেজির হাত এসে গেছে, ধাঁচ গেছে বদলে। নইলে খালি গ্রামার কণ্ঠস্থ করে আর ইডিয়ম নিয়ে টানাটানি করে ইংরেজি শেখা চলে না। আরে বাপু, সিন্‌ট্যাকসের রুল কি ইংরেজির বীচি যে মাথার মধ্যে পুঁতলেই সেখানে ইংরেজি সাহিত্যের চারা গজাবে। তা হয় না হে, তা হয় না। মুখস্থ করো—স্রেফ মুখস্থ করো।

শৈলেশবাবুর ইংরেজি পড়াবার মূল নীতিই এই। টেক্সট বই পড়ানোর সাথে সাথে তিনি খাতা-ভর্তি কোটেশন ছেলেদের লিখিয়ে দেন। হোমার, সেক্সপীয়র, বায়রণ, মিল্টন, বার্ক, সেরিডন

রাস্‌কিন, মেকলে, ল্যাম্ব, হেজলিট : ইংরেজি সাহিত্যের সমুদ্র মন্থন করে তিনি সংগ্রহ করেছেন এক কোটেশনের খাতা। সেখানি তাঁর ইংরেজি-শিক্ষার অমর কোষ। বিভিন্ন ক্লাসের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুসারে তাই থেকে তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি কোটেশন লিখিয়ে দেন। সেগুলো মুখস্থ করে করে ছেলেরা ইংরেজি স্বর্গের সিঁড়ি পার হয় একের পর এক।

বেশ মনে পড়ে—শৈলেশবাবুর ইংরেজির ক্লাস চলেছে। বাঁধানো মোটা খাতাটা দু' আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরে শৈলেশবাবু ক্লাসময় পায়চারী করছেন। আর বড় বড় লেখকদের সব লম্বা লম্বা খটমট সেন্‌টেন্‌স্ বলে যাচ্ছেন পর পর। আমরাও সেগুলো সযত্নে টুকে নিচ্ছি বাড়িতে মুখস্থ করব বলে।

সাগরের হাত কিন্তু স্তব্ধ। ও লিখছে না একটি লাইনও। শুধু হাঁ করে শুনে যাচ্ছে।

শৈলেশবাবু দু-তিনবার লক্ষ্য করলেন। তারপর একটু শ্লেষ করে বললেন, সাগর যে হাত গুটিয়ে বসে আছ? তুমি কি একেবারে বিদ্যাসাগর বনে গিয়েছ নাকি?

সাগর দাঁড়িয়ে বললো, না স্যার, পেন্সিলটা হারিয়ে গেলো কিনা পথে, তাই। তবে আপনি যা বললেন, তা তো মনেই আছে। বাড়ি যেয়ে একেবারে ফেয়ার খাতায় তুলে নেব।

শৈলেশবাবু রেগে বললেন, কি বললে? চার-চারটে কোটেশনই তোমার মনে আছে? এসব ছেলেখেলা পেয়েছ?

নির্বিকারভাবেই সাগর জাবাব দিলো, তা কেন স্যার? মনে আছে তাই বললাম।

শৈলেশবাবু এবার ধৈর্য হারালেন। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, মনে আছে তাই বললাম! আচ্ছা, বলো দেখি কার কার কোটেশন আমি লিখিয়েছি আজ, বুঝি কেরামতি!

সাগর অনায়াসে অবৃত্তি করলো যেন, সেক্সপীয়র, ল্যাম্ব, আর বার্কের ছুটো কোটেশন স্যার।

অবাক হলাম। এ সব নাম শৈলেশবাবুর ক্লাস করবার আগে কোন দিন কানেও শুনি নি। এগুলো মানুষের নাম না পাহাড়ের নাম, তাই বা কে তখন বুঝতো। পাতা উল্টে দেখলাম, সাগর কিন্তু তিনটে নামই সঠিক উচ্চারণ করে বলে দিয়েছে। আশ্চর্য।

পরম আশ্চর্য তখনো বাকি ছিলো। শৈলেশবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড সাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ, এবার বলো দেখি কোটেশন চারটে। তবে বুঝব তুমি বাহাত্বর ছেলে বটে।

যেন সত্যেন দত্তের 'ঝর্ণা' কবিতা মুখস্থ বলছে, এমনি সহজ গলায় সাগর চারটে লম্বা কোটেশনই অবিকল আউড়ে গেলো।

আমরা হতবুদ্ধি। শৈলেশবাবু চুপচাপ।

একটু পরে হাতের বাঁধানো খাতাটা সাগরের হাতে দিয়ে বললেন, আমার সব চেয়ে প্রিয় বই এই 'কালেকশন বুক' আমি তোমায় উপহার দিলাম সাগর। এ মণি-মুক্তার ঝুলি তোমার হাতেই শোভা পায়।

সাগর এগিয়ে যেয়ে শৈলেশবাবুকে প্রণাম করলো।

শৈলেশবাবু ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভাল করে পড়াশুনো করো সাগর, ম্যাট্রিকে তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে ষ্ট্যাণ্ড করতেই হবে। আর তুমি তা করবেও। তোমার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।

সত্যি সাগর অসাধারণ। আর দশটা ছেলের সাথে ওর কিছুই মেলে না। সকলের মাঝেও ও অনন্যসাধারণ।

তাই তো ওর কথা মনে হলেই আমি আকাশে চোখ ফেরাই শুকতারার সন্ধানে।

বহু তারার মধ্যেও যে নক্ষত্র স্বয়ংপ্রকাশ তারি সাথে সাগরের সত্যিকারের মিতালি।

॥ ২ ॥

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। উজ্জ্বল শুকতারা কি থর্ থর্ করে কাঁপছে?

তীব্র বেদনায় নীল হয়েছে কি তার প্রশান্ত আনন?

কোথা হতে এলো এত বিষ?

কে ঢাললো?

কোন্ বিষহরি?

মিসেস মুখার্জির কথা মনে পড়েছে। সাগরের কাছেই শুনেছিলাম তার কথা।

আশ্চর্য নারী।

স্বামী-পুত্র-কন্যার সাজানো সংসার। চোখে-মুখে-চেহারায় মাতৃত্বের মাধুর্য।

সেই মাধুর্যেই তো মন ভুলেছিলো সাগরের। ও কেমন করে জানবে সে মাধুর্যের অন্তরালে লুকিয়েছিলো বিষাক্ত বিষহরি? কেমন করে জানবে তার উদ্যত ফণার বিষাক্ত ছোবলে নীল হয়ে যাবে ওর গৌরতনু? পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে ওর জীবনের সব স্বপ্ন? সব আশা?

একান্ত আকস্মিক ভাবেই মিঃ মুখার্জির সঙ্গে সাগরের পরিচয় ঘটেছিলো।

তিনটে 'লেটার' নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে জেলা শহরে গিয়েছিলো সাগর। দুঃসাহসই করেছিলো। বিরাট পৃথিবীতে ও তখন একেবারেই আশ্রয়হীন, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল। সংসারে একমাত্র আশ্রয় নিম্নবিত্ত মামার আকস্মিক মৃত্যুতে ওর পায়ের তলা থেকে যে মৃত্তিকা-

খণ্ড সরে গিয়েছিলো, একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই তার জায়গায় ও পেয়েছিলো প্রাণতোষবাবুর প্রাণ-ভূমির পরম নির্ভর আশ্রয়। সেদিন ধন্য হয়েছিলো, কৃতকৃতার্থ হয়েছিলো ওর জীবন। তারপর একদিন অকারণ এক ভুল বোঝাবুঝির তরঙ্গাভিঘাতে সে ভূমিখণ্ডও নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেলো। সাগর তবু হাল ছাড়লো না। প্রতিকূল স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করেই এগিয়ে চললো।

সেই অবস্থাতেই একদিন হাজির হলো জেলা শহরে। মনে তখন অনেক আশা। কলেজে ভর্তি হবে। একটার পর একটা ডিঙিয়ে যাবে পরীক্ষার সিঁড়ি। মনে ভরসা আছে তা ও পারবে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভাল ফল ও করতে পারে নি। ইউনিভার্সিটিতে স্ট্যাণ্ড করা তো দূরে থাক, একটা স্কলারশিপও জোটেনি ওর কপালে। তাহোক, তার জন্যে তো ও একাই দায়ী নয়। দায়ী ঘটনাচক্র। নইলে যে প্রাণতোষবাবু ওকে পুত্রাধিক স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তিনিই বা এতটা ভুল ওকে বুঝবেন কেন? আর জমিদার বাড়ির থিয়েটারকে কেন্দ্র করে বার্ষিক পরীক্ষার ঠিক আগে এমন একটা কাণ্ডই বা হঠাৎ ঘটবে কেন যার ফলে রাতারাতি ওকে স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হলো নতুন স্কুলের সন্ধানে? তাইতো ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফল ও ভাল করতে পারলো না। তবু তো তিনটে লেটার পেয়েছে। তাকেই একমাত্র সম্বল করে ও গেলো জেলা শহরে কলেজে ভর্তি হবে বলে।

শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ালো কয়েকদিন। একটা সস্তার হোটেলে ছবেলা খায়। সারাদিন শহরের পথে পথে কলেজের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। একটা থাকবার আস্তানার জন্য একে-ওকে-তাকে অনুরোধ করে। কিন্তু কোনই ফল হয় না। এক অজ্ঞাত-কুলশীল যুবককে বাড়িতে আশ্রয় দিতে কেউ রাজী হয় না। সারা-দিনের ব্যর্থশ্রমের পর রাতে হোটেলে ফিরে ঢালা মাছুরের বিছানায় হোটেলের তেল-চিটচিটে বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

এমনি করেই কয়েকটা দিন কেটে গেলো। পকেটের যৎসামান্য সঞ্চয় কমতে কমতে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকলো। এখন উপায়? মহা ভাবনায় পড়লো সাগর।

ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ একদিন বিকেলে মিঃ মুখার্জির সঙ্গে সাগরের পরিচয় ঘটলো।

শহরের একেবারে কোল ঘেঁসে নদী। তার তীর বরাবর পীচ ঢালা কালো রাস্তা। চমৎকার ষ্ট্র্যাণ্ড্। পথের পাশে সবুজ ঘাসের ফালি কালো রাস্তার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে নদীর দিকে মুখ করে লোহার বেঞ্চি পাতা। মিউনিসিপ্যালি-টির বদান্য ব্যবস্থা। সকাল-বিকেলে মুক্ত বায়ুসেবীর দল যাতে পথভ্রমণের শ্রম লাঘব করতে পারে খানিক বসে জিরিয়ে তারি জন্যে এই ব্যবস্থা।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে তারি একখানি বেঞ্চিতে বসে ছিলো সাগর। দুই হাতের ভিতর মাথাটা গুঁজে চোখ বুজে ভাব-ছিলো নিজের অসহায় অবস্থার কথা। কখন যে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওর পাশেই এসে বসেছেন ও তা টেরই পায় নি।

ভদ্রলোক বোধহয় অনেকক্ষণ থেকেই ওকে লক্ষ্য করছিলেন। তাই ও যখন এক সময় উঠে যেয়ে পথের পাশের কল থেকে খানিকটা জল খেয়ে আবার এসে বেঞ্চিতে বসলো তখন সহানুভূতি-ভরা গলায় তিনিই প্রথম কথা বললেন, হ্যাঁ বাবা, তুমি কোথায় থাক?

সাগর তাঁর মুখের দিকে চেয়ে নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিলো, এই শহরেই একটা হোটেলে থাকি।

একটু চুপ করে থেকে ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন, এখানে কি করো তুমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

এ ধরনের নাক-গলানো প্রশ্নে সাগর হয়তো বিরক্তই হতো। কিন্তু কি যেন মধু ছিলো ভদ্রলোকের গলায়, সাগরের মন তাতেই গললো। তাঁর মুখের দিকে চাইলো ভাল করে। পঞ্চাশোর্ধ্ব

সৌম্য চেহারা। মাথার চুল প্রায় সাদা। মাঝে মাঝে কালোর ইসারা। চোখ দুটি কোটরগত। তার নীচে অনেকটা করে বাড়তি মাংসপিণ্ড বাইরে ঠেলে বেরিয়েছে। দেখেই মনে হল, এ চোখের নীচে নিশ্চয় আছে অনেক অশ্রুতে ভেজা একটি দরদী মন।

ভদ্রলোকের দরদী প্রশ্নে সাগরের মন তাই সাড়া দিলো। ও বললো, আজ্ঞে, জিজ্ঞেস করতে নিশ্চই পারেন। তবে দেবার মত জবাব আমার কিছু নেই।

আরো একটু সরে এসে ভদ্রলোক বললেন, সে তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিলো। তবু কেন এখানে এসেছ বলো তো?

সব কথাই সাগর খুলে বললো। শুনেই ভদ্রলোক সোল্লাসে বলে উঠলেন, এই দেখো, একেই বলে যোগাযোগ। আমিও যে তোমাকেই খুঁজছি বাবা।

বিস্মিত চোখ তুলে সাগর বললো, তার মানে? আপনি আমাকে খুঁজছেন?

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। শোন তা হলে। আমার নাম সদাশিব মুখার্জি। উকিল পাড়ায় আমার বাসা। ওকালতিই আমার পেশা কিনা। পাড়ায় সবাই আমাকে মিঃ মুখার্জি বলেই ডাকে। ওই ডাক শুনতে শুনতে প্রায় ভুলেই গিয়েছি যে মিঃ মুখার্জি ছাড়াও একটা নাম আমার আছে।

বলতে বলতে ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে উঠলেন।

সাগর ভাল-মন্দ কিছুই বুঝতে না পেরে আমৃতা আমৃতা করে বললো, কিন্তু, আপনি যে বললেন—

হাসি থামিয়ে ভদ্রলোক বললেন, বলছি, বলছি, কেন যে তোমাকে আমি খুঁজছি, সব কথা খুলে বললেই তুমি বুঝতে পারবে যে আমি মিথ্যে বলি নি।

অনেক কাল পরে কলকাতার ইডেন গার্ডেনের জলার ধারে ঘাসের

উপর শুয়ে, জীবনের একটি আশ্চর্য অধ্যায়ের এই সূচনা-কাহিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে সাগর আমাকে বলেছিলো, দেখ্‌ তরুণ, মানুষের ভিতর-বাহিরে যে এতো ফারাক এ যদি আগে জানতাম। নইলে মিঃ মুখার্জির মুখে সেদিন যে প্রাণখোলা কলহাস্য শুনেছিলাম তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম যে সেই হাসির অন্তরালে বয়ে চলেছে বেদনার এক দুকূল-ভাঙা দুর্বার বন্যা!

সেদিন সে-কথা সাগর স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। আরো ভাবতে পারে নি যে সাগরকে সেদিনের নিরাশ্রয়তা থেকে উদ্ধার করে নিজের কাছে আশ্রয় দেবার জন্যই মিঃ সদাশিব মুখার্জি নিজের মুখের উপর কলহাস্যের মুখোশ টেনে দিয়েছিলেন।

হাসতে হাসতে তিনি বলেছিলেন, দেখো বাবা আমি বড়লোক নই। তবে গেরস্ত ঘরের মত ডাল-ভাতের সংস্থান আমার আছে। সংসারে আমরা তিনটি প্রাণী। আমি, আমার স্ত্রী ও আমার মেয়ে লাবণ্য। আর আছে গুণধর—আমার কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড। বাজার করে, রান্না করে, মেয়েকে স্কুলে আনা-নেওয়া করে। মানে এক কথায় সংসারের রথের চাকা সেই টানে। আমি একটু-আধটু তেল জোগাই মাত্র।

বলেই মিঃ মুখার্জি আবার হেসে উঠলেন। সাগরের অবস্থা তখন ত্রিশংকুর মত না—মাটিতে, না স্বর্গে। মিঃ মুখার্জি হঠাৎ তার কাছে এত সব পারিবারিক বিবরণই বা কেন দিচ্ছেন, আর অজ্ঞাত পরিচয় ক্ষণিকের-দেখা তাকেই বা কেন খুঁজছেন, এর কোন হদিসই সাগরের মাথায় ঢুকলো না যতক্ষণ না মিঃ মুখার্জি একেবারে আসল কথায় এসে বললেন, ম্যাট্রিকে তিনটি 'লেটার' পেয়েছ, তুমি তো ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে। আমার ইচ্ছে তুমি আমার বাড়িতে থেকে কলেজে ভর্তি হও, আর তোমার সুযোগ-সুবিধা মত আমার মেয়ের স্কুলের পড়ায় একটু সাহায্য করো।

বিস্ময়ের শূন্য পার হয়ে এতক্ষণে সাগর যেন শক্ত মাটিতে পা

রাখতে পারলো। উপুড় হয়ে মিঃ মুখার্জির পায়ের ধূলো নিয়ে বললো, আপনি উদার, মহৎ। কি বলে যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব—

বাধা দিলেন মিঃ মুখার্জি, হঠাৎ অতোটা উচ্ছ্বসিত হয়ো না বাবা। আমার বাড়িতেই যখন থাকবে তখন ধীরে ধীরে নিজেই জানতে পারবে যে এতোটা ভক্তির পাত্র আমি নই। এতো ভক্তি-শ্রদ্ধা আমাকে কেউ করে না—প্রতিবেশীরা না, সহকর্মীরা না, এমন কি আমার স্ত্রী-কন্যাও না।

সেইদিন থেকেই সাগর মিঃ মুখার্জির পরিবারে পঞ্চম সদস্যের আসনে পাকা হয়ে গেলো।

কিন্তু হায়রে! জীবনের পাশা খেলায় পাকা ঘুঁটিও যে বে-চালের ফলে কাঁচা হয়ে যায়, এ তথ্য তখনো সাগরের জানা হয় নি। জীবনের গণিতে যে দুই আর দুয়ে সব সময় চার হয় না, সব ভাবনা-কল্পনা-প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে কখন যে কোন্ অভিনব অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে বসে, দুই আর দুইয়ের যোগফল হয়ে দাঁড়ায় পাঁচ, সে সত্য সাগর জেনেছিলো আরো অনেক পরে।

কিন্তু মুখার্জি-পরিবারের একটি রহস্য সাগর মাত্র কয়েকদিন থেকেই জানতে পেরেছিলো। কর্তা-গিন্নি-কন্যাকে নিয়ে সংসার। আলাদা ভাবে প্রত্যেকেই চমৎকার লোক। মিঃ মুখার্জি নামেও সদাশিব, চরিত্রেও তাই। আইনের ব্যবসায়ে যৎসামান্য যা উপার্জন করেন সংসার খরচ বাবদ তাই স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে সংসারের প্রতি নিজের দায়িত্ব শেষ করেন। তারপর মেতে থাকেন নিজের পড়া-শুনা পূজা-অর্চনা নিয়ে। সংসারের সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না।

মিসেস মুখার্জি আশ্চর্য বুদ্ধিমতী মেয়ে। সংসারে সকলেরই সুখ-সুবিধার প্রতি তাঁর সদাসতর্ক দৃষ্টি। মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়েই সাগরকে তিনি একেবারে আপনার করে নিলেন। সাগরও তাঁকে 'মাসিমা' বলে পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজলো।

আর লাবণ্য? হাসিতে খুশিতে চপল কলহাস্যে সে যেন একটি উচ্ছল ঝরণা। সাগরের আবির্ভাবের দিনটি থেকে এক মুহূর্তের জন্যে লাবণ্য তাকে বুঝতে দিল না যে সে একজন অজ্ঞাতপূর্বপরিচয় অনাত্মীয় যুবকমাত্র—এ বাড়িতে একান্তই দুদিনের অতিথি। সাগরের আহার-নিদ্রা থেকে প্রতিটি খুটিনাটি প্রয়োজনের ব্যবস্থা সে এমন নিখুঁত ভাবে করে রাখে যেন সাগর এ বাড়িতে আবাল্যের অধিবাসী তার স্বভাব-চরিত্র লাবণ্যের যেন নখ-দর্পণে।

অথচ এই তিনটি প্রাণীকে নিয়ে একটি সুন্দর পারিবারিক সংহতি যেন গড়ে ওঠে নি। প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেকের মাঝে কোথায় যেন একটা দুর্নিরীক্ষ্য ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া হয়ে আছে। আশেপাশেই এরা ঘুরছে, ফিরছে, চলছে। অথচ এক হয়ে উঠতে পারছে না। সাগর অবাক হয়ে ভাবে: কেন এমন হয়? কেমন করে হয়?

সাগর কলেজে ভর্তি হলো।

তিনটে 'লেটার'-এর জোরে কেবলমাত্র ভর্তি ফি নিয়েই অধ্যক্ষমশায় ওকে ভর্তি করে নিলেন। ভরসা দিলেন ফুল-ফ্রির। সাগরের মনের আকাশে রামধনু হাসলো।

সপ্তবর্ণের আভাসে রাঙা হলো আরো একজনের মন। সে লাবণ্য। মিঃ মুখার্জির মেয়ে। সাগরের ছাত্রী।

একদিন সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরে সাগর দেখলো, পড়ার ঘরে তখনো আলো জ্বলে নি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে অনেকক্ষণ। লাবণ্য এখনো পড়তে বসে নি। সাগরের মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠলো। সে লক্ষ্য করেছে লাবণ্য ইদানীং পড়াশুনায় তেমন মনোযোগ দিচ্ছে না। কেমন যেন একটা অকারণ অন্যমনস্কতা। আকারে ইঙ্গিতে সাগর সেদিকে তার দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নি।

বিরক্তকণ্ঠে সাগর ডাকলো, লাবণ্য—

রান্নাঘর থেকে জবাব দিলো লাবণ্য, আমি রান্নাঘরে সাগরদা। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে শিগগির আসুন। আপনার জলখাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

এক মুহূর্ত কি ভেবে সাগর সশব্দে রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে গেলো। খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলো, লাবণ্য উনুনে কেটলি চাপিয়ে চায়ের কাপ সাজাতে ব্যস্ত। চায়ের আয়োজনটা যে তারি জন্য হচ্ছে এ কথা বুঝতে পেরেও একটু রুক্ষ গলায় সাগর বললো, এতো রাত অবধি যদি তুমি রান্নাঘরেই কাটাও তাহলে পড়াশুনা করবে কখন?

মুখ না ফিরিয়েই লঘুকণ্ঠে লাবণ্য বললো, এই হয়ে গেলো সাগরদা। আপনার চা-টা ঢেলে দিয়েই যাচ্ছি। আপনি চটপট হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।

সাগর তবু দরজা থেকে নড়লো না। জিজ্ঞাসা করলো, মাসিমা কোথায় লাবণ্য? তাঁকে তো দেখছি না।

চায়ের কেটলি নামাতে নামাতে লাবণ্য জবাব দিলো, মা তো সেই বিকেলে বেরিয়েছে, এখনো ফেরে নি।

একটু চুপ করে থেকে সাগর আবার প্রশ্ন করলো, তোমার বাবা চা-জলখাবার খেয়েছেন?

লাবণ্য বললো, বাবা তো কোর্ট থেকে ফিরে চা-জলখাবার খেয়ে তারপর ক্লাবে গেছেন।

—তাঁর চা-জলখাবারও কি তুমিই করে দিয়েছিলে?

—বারে, তা কেন? জলখাবারটা তো মা-ই তৈরি করে রেখে গিয়েছিলো। আমি তো শুধু চা-টা করে দিয়েছি। মা-ই বলে গিয়েছিলো, চা-টা যেন গরম গরম তোমাদের দুজনকে তৈরি করে দি।

ঠিক এই জবাবই লাবণ্য দেবে এটা যেন সাগর আগে থেকেই জানতো। এ-বাড়ির এই একটা আশ্চর্য ধারা। কার কখন কি

দরকার কর্তব্য-মাফিক সবাই ঠিক করে যাচ্ছে। তাতে কোথাও কোন ত্রুটি নেই। মিঃ মুখার্জি সংসার-খরচের টাকা সাধ্যমত স্ত্রীর হাতে তুলে দেন। সেখানেই তাঁর কর্তব্য শেষ। সকাল বেলা মক্কেল, দুপুরে আদালত, সন্ধ্যায় ক্লাব আর অনেক রাত অবধি মামলার নথি-পত্র নিয়েই তাঁর দিন কাটে। এই কর্ম-বৃত্তের বাইরে স্ত্রী-কন্যার প্রতি আর কোন আসক্তি তাঁর আছে বলে মনে হয় না। মিসেস মুখার্জিও পরিবারের সকলের আহার থেকে নিদ্রা পর্যন্ত সব ব্যবস্থা নির্ভুল ভাবে করে রাখবেন। কিন্তু নিজে কোথাও ধরা-ছোঁয়া দেবেন না। যেন একটি নিরলস মেসিন। আর এই দুই মেসিনের মাঝখানে একটা যান্ত্রিক যোগসূত্র যেন লাবণ্য। নিজের খেয়াল মতোই সে স্কুলে যায়, পড়াশুনা করে, সংসারের ছোটখাট অনেক কাজও করে। কিন্তু সবই যেন কেমন প্রাণহীন। এটা যেন একটা বাড়ি নয়—একটা সুশৃঙ্খল বোর্ডিং হাউস।

দেখে শুনে সাগর বিরক্ত হয়। ভাবে: এ কেমন করে হয়? কেন হয়?

সেই বিরক্তিই ঝরে পড়ল তার গলায় যখন সে বললো, আমি পড়ার ঘরে গেলাম। আমার চা-টা বরং সেখানেই নিয়ে এসো।

বলেই হন্ হন্ করে সাগর পড়ার ঘরের দিকে চলে গেলো। চায়ের কেটলিটা হাতে নিয়ে লাবণ্য হাঁ করে তার গমন-পথের দিকে চেয়ে রইলো। তার বুকের ভিতরটা ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠলো। সাগরের কাছ থেকে এমন অকারণ রূঢ় আঘাত সে প্রত্যাশা করে নি।

চা-জলখাবার নিয়ে লাবণ্য একটু দেরি করেই পড়ার ঘরে ঢুকলো। একা একা বসে বসে সাগর মনে মনে আরো বিরক্ত হচ্ছিলো। জল-খাবারের ডিসটা এক পাশে সরিয়ে রেখে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললো, কাল ক্লাসে কি কি পড়া আছে বলো?

লাবণ্য রুটিন খুলে অভিমানক্ষুব্ধ গলায় বলে গেলো সব। সাগর ওকে একটা ট্র্যানস্লেসন করতে দিয়ে আবার চায়ের কাপে চুমুক

দিলো। লাবণ্য ট্র্যানশ্লেসন করতে লাগলো আপন মনে।

এক সময়ে সাগর বললো, দেখো, তোমাকে একটা কথা বলছি। তোমাদের বাড়িতে আমি শুধু খেয়ে-পরে ফুর্তি করতে আসি নি। এসেছি তোমাকে পড়াতে। সেই পড়াশুনাতেই তুমি যদি এমন গাফিলতি করো তাহলে তো আমার এখানে থাকাই চলে না।

চম্‌কে মুখ তুললো লাবণ্য। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, সে কি সাগরদা, আপনি আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাবেন?

উদাসীন কণ্ঠে সাগর জবাব দিলো, তুমি ঠিক মত পড়াশুনা না করলে নিশ্চয়ই চলে যাব।

সাগরের কথাটা যেন একেবারেই অবিশ্বাস্য এমনি ভঙ্গীতেই লাবণ্য বললো, আপনি যেতে পারবেন?

সাগরও কেমন মরিয়া হয়ে জবাব দিলো, কেন পারব না? এটা তো আমার নিজের বাড়ি নয়। আজ হোক, কাল হোক, যেতে তো আমাকে হবেই।

লাবণ্য আর কোন কথা বললো না। ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় গুঁজে সেই যে মুখ নীচু করলো সাগরের প্রশ্নের পর প্রশ্নেও আর সে মুখ তুললো না। না দিলো ওর কথার কোন জবাব, না মুখ খুলে উচ্চারণ করলো পড়ার একটি শব্দ। পাষাণ পুত্তলীর মতো নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো।

অনেক ব্যর্থ প্রশ্নের পর সস্নেহে ওর মুখখানি তুলে ধরে সাগর সবিস্ময়ে দেখলো, লাবণ্যের দুই গাল বেয়ে নেমেছে চোখের জলের ধারা।

বিস্মিত সাগরের চোখের সামনে থেকে মানব-মনের বিচিত্র রহস্যের একটা যবনিকা যেন অপসারিত হলো। এতোদিন সাগর জানতো, এ বাড়ির প্রত্যেকটি লোক তার জন্য যা কিছু করে সেটা একটি আশ্রয়হীন, ভাগ্যহীন তরুণের প্রতি স্বাভাবিক অনুকম্পা ও করুণা-বশতঃই করে। কিন্তু এ বাড়ি সে একদিন ছেড়ে যাবে এই সম্ভাবনার

কথা কল্পনা করেই এই কিশোরী মেয়েটির মন এমন দুঃসহ ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠবে, অঝোর ধারায় অশ্রু নামবে তার দুই চোখে, এ যে সাগরের কল্পনারও অতীত। সহসা একটা গভীর মমতার স্পর্শ লেগে তার মনের সব বিরক্তি সব রূঢ়তা যেন গলে জল হয়ে গেলো। এই দরদী কিশোরীটির জন্য প্রীতি-সুধারসে ভরে গেলো তার মনের পাত্র।

রসের সাগরে মনের ভেলা ভাসালো দুটি তরুণ-তরুণী। সাগর আর লাবণ্য। সংসারে সর্বহারা সাগর। পরম নির্ভয়ে একদিন আশ্রয়ের আশায় নোঙর ফেলেছিলো প্রাণতোষবাবুর প্রাণের বন্দরে। কিন্তু অকাল বৈশাখীর নিদারুণ ঝড়ে সে বন্দর একদিন ভেঙে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। দিকচিহ্নহীন অন্ধকার সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এবার তার জীবণ-ভেলা ভিড়েছে আর একটি তরুণীর মনের বন্দরে। তার তরুণ মনকে ছুঁয়েছে প্রথম প্রেমের সোনার কাঠি। শুধু স্পর্শ করে নি, আন্দোলিত করেছে, আলোড়িত করেছে, রঙে রঙে রাঙা করে তুলেছে।

দেখতে দেখতে এগিয়ে এলো সাগরের ষান্মাষিক পরীক্ষা। পড়া-শুনা এতোদিন বিশেষ কিছুই হয় নি। সাগর রাত জেগে পড়তে আরম্ভ করলো। যেমন করেই হোক তাকে ভাল ভাবে পাশ করতেই হবে। সফল করতে হবে নিজের জীবনকে। তবেই তো লাবণ্যর পাশে সে দাঁড়াতে পারবে নিজের যোগ্যতায়।

সাগর রাত জেগে পড়ে। তাকে কাপের পর কাপ চা জোগায় লাবণ্য। স্কুলের পড়ার অজুহাতে সেও রাত জাগে।

একেক দিন পড়া নিয়ে সাগর একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। রাত বারোটা বেজে যায়। সাগরের তবু খাবার সময় হয় না। খেলেই যে ঘুম পেয়ে যাবে।

এ দিকে মায়ের শোবার ঘরে দুজনের খাবার মেঝেতে ঢেকে রেখে

লাবণ্য চোখের সামনে বই খুলে রেখে বসে ঝিমোয়। যেদিন কিছুতেই আর ঘুমকে আটকাতে পারে না সেদিন সাগরের ঘরের দরজার সামনে এসে গুন গুন করে গান ধরে :

কি গো সাগরবাবু,
আজ তোমার কি খাওয়া হবে না ?
একজামিনের পড়া বলে
আর কারো কি ক্ষিদে পাবে না ?

গান শুনে সাগরের চমক ভাঙে। তাই তো রাত যে অনেক হয়েছে। দুই হাতে চোখ রগড়ে সাগরও গানের সুরেই জবাব দেয় :

ক্ষিদে যার সেই তো থাবে,
অপরে তো খেয়ে দেবে না।
আমি তো কারো খাওয়া
আটকে রাখি না।

ডান গালে তর্জনী রেখে লাবণ্য হেসে বলে, ও মা! সাগরবাবুর গলায় দেখছি গানও খোলে বেশ। দোহাই তোমার সাগরদা, একটা গান শোনাও।

সাগর বই-খাতা বন্ধ করতে করতে বলে, দুর পাগল! এই এতো রাতে? সে শোনাব আর একদিন। এখন খেতে দাও। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

খুশি মনে দুজন খেতে বসে। অন্ন-ব্যঞ্জনে উদর যতো না ভরে বাণীর ভোগে মন ভরে তার চেয়ে অনেক বেশী।

খাওয়া শেষ হলে সাগরকে তার ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায় লাবণ্য। হঠাৎ তার হাতটা ধরে বলে, এই এতো রাতে আবার কিন্তু বই নিয়ে বসতে পারবে না। এখুনি শুয়ে পড়গে।

তারপর চোখে-মুখে মিষ্টি হাসির ঢেউ খেলিয়ে বলে, আর—শুয়ে শুয়ে একটা গান করো সাগরদা গুন গুন করে। ও ঘরে শুয়ে শুয়ে আমি শুনব।

সে রাতে সাগর গেয়েছিলো রেকর্ডে শোনা একটা নতুন গান :

'ওই নয়নের নীল সায়রে
হারিয়ে যাব প্রিয়া—'

সে গান শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো লাবণ্য। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলো, কার হৃদয়-সমুদ্র যেন অশান্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। ছোট্ট একটা পাল-তোলা নৌকো আশ্রয়হীন পারাবতের মত ঘুরতে ঘুরতে এসে সে অস্থির সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে যেন দুলতে লাগলো।

দুলতে দুলতে সে কি হারিয়ে গেলো? কোথায় গেলো?

কিন্তু সে দুর্ঘটনা আরো অনেক পরের। জীবনের পথে সাগর তখন আরো অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েও সে আঘাতকে সহ্য করবার শক্তি অর্জন করেছে। সাগরের দুর্জয় সংগ্রামের সে কাহিনী এখন থাক। তার বিচিত্র জীবন-কাহিনীর গোড়ার কথায়ই ফিরে যাই এবার।

॥ ৩ ॥

দেখতে দেখতে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা এসে গেলো। ফল বের হলো। সাগর ফার্স্ট হয়েছে। সুশীল সেকেণ্ড। দুজনের মোট নম্বরের তফাত একশোর বেশী। এক ভূগোল ছাড়া আর সব বিষয়ে সাগর ফার্স্ট।

হেডমাস্টারমশায় প্রমোশন ডেকে গটগট করে চলে গেলেন। একটু পরে হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন প্রাণতোষবাবু। হাতে রেজাল্ট-বুক। একে একে তিনি ছেলেদের পরীক্ষার নম্বর বলতে লাগলেন।

সুশীলের নম্বর ডেকে বললেন, সুশীলের ইংরেজীর মার্ক বড় খারাপ হয়েছে হে। ইংরেজীটার উপর আরো জোর দিয়ে পড়ো। উইশ ইউ বেটার সাক্‌সেস্‌ নেক্সট ইয়ার।

আর একটি ছেলের মার্ক ডেকে সাদরে বললেন, এ-হে-হে অংকে তোমার মার্ক যে বড্ডো মিজারেবল্‌, পেয়েছ মাত্র তেত্রিশ। অথচ ইরেজীতে পেয়েছ তিয়াত্তর, ইতিহাসে পেয়েছ পঞ্চাশের মধ্যে আট-চল্লিশ। গৌরীশংকর স্মরণ করে অংকের সাধনায় মন দাও।

সমরেশ অন্যান্য বিষয়ে টায়-টায় পাশ। ভূগোলে কিন্তু পেয়েছে পঞ্চাশের মধ্যে পঞ্চাশ। প্রাণতোষবাবু প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন, ওঃ! আই সি, হিয়ার ইজ এ নিউ কলাম্বাস! কে হে তুমি?

সলজ্জ হাসি হেসে একটি হ্যাংলা ছেলে উঠে দাঁড়ালো।

প্রাণতোষবাবু বললেন, সারা জগতের নিখুঁত খবর রাখো, আর ভারতের ইতিহাস জানো না? ইতিহাসে পেয়েছ মোটে একুশ, আর ভূগোলে হলে ফার্স্ট?

সুশীলের উপদলীয় একটি ছেলে ও-পাশ থেকে বলে উঠলো, ওতো ব্র্যাকেটে ফার্স্ট হয়েছে স্যার।

—বটে? তাহলে কেবা সেই দ্বিতীয় ভাগ্যবান?

মাথা হেঁট করে দাঁড়ালো সুশীল। প্রাণতোষবাবু রেজাল্ট-বুকের পাতা ওল্টালেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বটে! ওঃ, আমাদের 'বিদ্যামন্দির'-এ দেখছি অনেক কলাম্বাস-লিভিংস্টোন-স্কট গোকুলে বাড়ছে। চিয়ারিও ইয়ং পায়োনিয়ারস্, চিয়ারিও!

ক্রমে এলো সাগরের নাম। ক্লাশের দিকে একবার চেয়ে প্রাণতোষবাবু নম্বর বলতে লাগলেন। সব বিষয়েই নব্বুইয়ের উপরে। অংকে একশো। ইতিহাসে উনপঞ্চাশ। একি? হঠাৎ প্রাণতোষ-বাবু থেমে গেলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, ভূগোল—একত্রিশ। বাঙ্‌লা সাতাশী……

নম্বর ডাকা হয়ে গেলো। খাতা বন্ধ করে গম্ভীর গলায় প্রাণতোষ-বাবু বললেন, সাগর, ছুটির পরে বাড়িতে আমার সাথে একবার দেখা করবে।

প্রাণতোষবাবু চলে গেলেন।

ক্লাস শুদ্ধ হৈ-চৈ পড়ে গেলো। নানা উক্তি, নানা মন্তব্য। সুশীলের উপদল এককণ্ঠে বলে উঠলো, এই রে, প্রিয় ছাত্র ভূগোলে কম নম্বর পেয়েছে, ওমনি প্রাণতোষবাবুর প্রাণ উঠেছে কেঁদে।

আরেক জন বললো, দেখলি না, হুতোম প্যাঁচার মতো মুখ কেমন হাঁড়ি হয়ে গেলো। কেমন গুম্ গুম্ করে—

বাধা দিলো সাগর, তিনি গুরুজন। তাঁর সম্বন্ধে ও রকম কথা বলা তোমার অন্যায়। ভবিষ্যতে আর কখ্‌খনো এমন বলবে না।

ছেলেটি ফোড়ন দিল জবাবে, কেন? তোমার ভয়ে নাকি?

আমারো রাগ হলো। বললাম, ভয়-ভীতির কথা তো নয়। সহজ ভদ্রতার কথা। ও ভাবে বললে গুরুজনের অপমান করা হয়।

একটি উপগ্রহ জ্বলে উঠলো, কী আমার হাঁসখালির ভদ্দোর রে!

সমুদ্রে দাবানলের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিলো। সাগর রুখে দাঁড়ালো, মুখ সামলে কথা বলো।

উপগ্রহের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি, এঃ, বিষ নেই সাপের কুলোপনা চক্কোর। এতো বড় ফণা তুলো না সাগর। এটা প্রাণতোষবাবুর ক্লাস-রুম নয়।

আরেকটি উপগ্রহ বললো, যেতে দে ভাই, যেতে দে। ভূগোলে বড়ই কম নম্বর পেয়েছে। ওর এখন মাথা গরম।

আরেক জন বললো, তার আর ভয় কি বাবা, মাথা এখুনি ঠাণ্ডা হবে। প্রাণতোষবাবু যখন হাত দিয়েছেন এতে, তখন তো ভূগোলের খাতা রি-একজামিন হবেই। তার পরে হাতের যদি গুণ থাকে তাহলে গনেশ উল্টে একত্রিশ একান্ন হতে কতক্ষণ?

উপদল হো হো করে হেসে উঠলো।

একজন শুধালো, সে কি রে? পরীক্ষাই তো পঞ্চাশের মধ্যে। তবে একান্ন পাবে কেমন করে?

রসিক কণ্ঠে জবাব এলো, দুর্ বোকচন্দোর, তাও জানিস্ না। মেরে বাচ্চা এইসি লেখা যে খুশিসে এক নম্বর মেরা পকেটসে দে দিয়া।

স-উপদল সুশীল কলরব করতে করতে চলে গেলো। আহত ক্রোধে মুখ কালো করে সাগর ক্লাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি বললাম, ওদের উপর রাগ করে কোন লাভ নেই সাগর। যার যেমন স্বভাব।

সাগর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ধরা গলায়, কি করব ভাই, ওরা দলে অনেক ভারী। নইলে কুলোপনা চক্কোরের বিষদাঁত ওদের দেখিয়ে দিতাম আজ।

শংকাতুর গলায় আপত্তি জানালাম, না না সাগর, ওদের সাথে হাঙ্গামা করে কাজ নেই। ওরা বড় খারাপ ছেলে।

সাগরের ঠোঁটে ম্লান হাসি, ভালো ছেলে আমিও না। আর অন্যায়ের সামনে হাত-পা গুটিয়ে থেকে ভালো ছেলে সাজতে আমি চাইও না। কিন্তু যাক্ সে কথা। চল্, রেলের রাস্তা দিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি গে।

পিছনের মাঠটা পার হয়ে দুজনে রেল লাইনের রাস্তা ধরলাম। রৌদ্রদগ্ধ রেলপথ ঝিল্‌মিল্ করে নাচছে।

খানিক দূর এগিয়ে আমি রেল-পুলের কালভার্টের উপর বসলাম। সাগর রেল-লাইন থেকে নেমে প্রাণতোষবাবুর বাড়ির পথ ধরলো।

প্রাণতোষবাবু টিফিন সাজিয়েই বসে ছিলেন। সাগর মৃদু আপত্তি জানিয়ে ডিসে হাত দিলো।

প্রাণতোষবাবু প্রশ্ন করলেন, ভূগোল কি তুমি এতই খারাপ লিখেছিলে সাগর, মাত্র একত্রিশ পেলে?

সাগর চুপ করে রইলো। জবাব দিলো না।

প্রাণতোষবাবু আবার বললেন, সব কথা তুমি অসংকোচে খুলে বলো সাগর। কোন ভয় নেই তোমার। আমার যেন মনে হচ্ছে—

তাড়াতাড়ি সাগর বাধা দিলো, না স্যার, ও সব কিছু আপনি মনে করবেন না। কি জানি, হয়তো আমার খাতাই খারাপ হয়েছে। তাছাড়া, ম্যাপ তো আমি সত্যি ভালো আঁকতে পারি না।

প্রাণতোষবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমার কি মনে হয় না সাগর, যে খাতা দেখতে বা মার্ক যোগ দিতে কোন রকম ভুল হতে পারে?

—ঠিক বলতে পারি না স্যার।

—তাহলে তোমার খাতাটা একবার রি-এক্‌জামিন করালে—

চমকে উঠলো সাগর। সুশীল গ্রুপের সম্ভাবিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কথা কানে এলো। ভীত গলায় বললো, না স্যার, না। সে আপনি করবেন না।

—কেন ? তোমার যদি সন্দেহ হয়ে থাকে, তাহলে হেডমাস্টার-মশায়কে আমি একবার বলতে পারি কথাটা।

—না স্যার, তাতে অনেক গোলযোগ হবে।

—কি গোলযোগ ?

একটু ইতস্ততঃ করে সাগর জবাব দিলো, রি-এক্‌জামিন করে যদি আমার নম্বর না বাড়ে, তাহলে সকলের চোখেই আপনি ছোট হয়ে যাবেন। আর সত্যি যদি নম্বর বাড়ে, তাহলেও ছেলেরা এ নিয়ে বড়ই মাতামাতি করবে স্যার। আপনার নামে অনেক কিছুই বলবে।

সাগর থামলো। প্রাণতোষবাবুর দিকে চেয়ে আবার বললো, তার চেয়ে যা আছে তাই থাক। ফার্ষ্ট তো আমি হয়েইছি।

প্রাণতোষবাবু চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। ধীরে ধীরে বললেন, তোমার মনের এই বৈরাগ্য দেখে ভারী খুশি হলাম সাগর। আশীর্বাদ করি, পৃথিবীর লাভ-ক্ষতি যেন কোন দিনই তোমার মনকে চঞ্চল না করে।

সাগর প্রাণতোষবাবুকে প্রণাম করলো। চোখ বুঁজে দুই হাত তিনি কপালে ঠেকালেন।

সাগর ফিরে আসতেই শুধালাম, কিরে, ব্যাপার কি ?

সব কথাই সাগর খুলে বললো। আমি বললাম, এ যে সখারাম-বাবুর কারসাজি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। খাতা রি-এক্‌জামিন-এর কথা বললেই ভাল হতোরে সাগর।

আলোচনাটা চাপা দেবার জন্যে সাগর হো হো করে হেসে উঠলো অর্থহীন ভাবে। বললো, দূর্ পাগল। ভূগোলে যে মহাপণ্ডিত আমি, রি-এক্‌জামিন করলে হয় তো মার্ক আরো বাদ চলে যাবে। সুদ গুণতে যেয়ে শেষে কি আসল হারাব ?

চুপ করলাম। নীরবে দুজনে চলেছি পথ। খেলার মাঠ পার হলেই দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত। ধান-কাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

মাঠের পর মাঠের বুক জুড়ে কেমন একটা উদাস ভাব। ফসল-হারা বিজন মাঠ মৃত্যুর প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ বুঝি।

মাঝে মাঝে সরিষা ক্ষেত। ধূসর প্রান্তরের প্রাণহীণতার মাঝে মাঝে সবুজের সে এক অপরূপ সমারোহ। মৃত্যুর বুকে জীবনের পদচিহ্ন আঁকা পড়েছে কোন্ অদৃশ্য তুলিকারের মায়া স্পর্শে!

চলতে চলতে আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা সাগর, অন্য সব সাবজেক্ট্ তোর কণ্ঠস্ত, আর একমাত্র ভূগোলই তুই মুখস্ত করতে পারিস না, এ কেমন ধারা কথা?

আজ সাগরের মনের পথে নেচে চলেছে কোন্ গভীরতর চিন্তার শোভাযাত্রা! এ-সব প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি কথাকে ও আমলই দিতে চায় না। সহজ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলো, ও হরি, ওই ভূগোলের কথাই এখনো তোর মাথায় গোল পাকাচ্ছে? আচ্ছা, ভূগোলে কয়েকটা নম্বর কম পেয়েছি তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে তরুণ?

—হয়নি কিছুই। কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন খটকা বলে মনে হচ্ছে?

—কেন?

—ভূগোল তো আর সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার কিছু না। কেবল তো কতকগুলি দেশ, নদী আর পাহাড়ের নাম। সব পারিস্, আর এই সোজা নামগুলো মুখস্ত করতে পারিস না,—এটা কি রকম?

হেসে জবাব দিলো সাগর, নাম মুখস্ত করতে পারি না কে বললো তোকে? খু-উ-ব পারি।

—তাহলে? সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

সাগর কিন্তু প্রাণখোলা হাসির সঙ্গেই উত্তর দিলো, যত গোল যে বাধায় ওই বিদঘুট্টি দেশের বিদঘুট্টি নামগুলো! জন্মেছি স্বপ্ন দিয়ে তৈরী দেশে। এর নামগুলিও স্বপ্নময়। শুনলেই মুখস্ত হয়ে যায়।

সাগরের কণ্ঠে লাগলো স্বপ্ন-সঙ্গীতের ছোঁয়াচ। ও আবৃত্তি

করতে লাগলো ভারতের নানা নগ-নদী নগরীর নাম : কেমন এখান কার দেশের নাম—কাশী, কাঞ্চী, কনখল ; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ। কি মধু এ দেশের নদীর নামে—গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনা, গোদাবরী, কাবেরী, বিতস্তা ; রেবা, শিপ্রা, ইরাবতী। আরো শোন্—ললিতগিরি, খণ্ড-গিরি, উদয়গিরি। বিন্ধ্য, হিমাচল, সুমেরু।

গলা নামিয়ে সাগর বললো, এ-সব ফেলে যখনি চোখের সামনে মরা মাছির মতো কালো কালো অক্ষরে ফুটে ওঠে পোপোকাটাপেট্ল আর কামস্কাট্কা, স্কাগাররাক্ আর কাট্টিগাট্, নোভোজেম্বলা আর ওখোটস্ক, তখনি যেন পিত্তি জ্বলে ওঠে,—মা সরস্বতী ত্রাহি ডাক ছেড়ে পালিয়ে যায় স্মৃতির কমল বন ছেড়ে।

সাগর হো-হো করে হেসে উঠলো। আমি বললাম, এ-সব তোর মন-গড়া কথা সাগর। ভালো-মন্দ নাম সব দেশেই আছে। কেমন আছে কি না ?

হাসতে হাসতেই সাগর জবাব দিলো, আরে তা আছে বই কি। ও আমি এমনি বললাম। আর এ কথাগুলোও আমার নয়। প্রাণতোষবাবু এক দিন কথায় কথায় এমন আরো অনেক উদাহরণ দিয়েছিলেন। ভারী ভাল লেগেছিলো কথাগুলো। নোটবুকে টুকে রেখেছিলাম। আজ সুযোগ পেয়ে তোর কাছে বিদ্যেটা জাহির করে নিলাম।

দুজনেই হেসে উঠলাম। বললাম, তাই বল্। আমি আরো এতক্ষণ অবাক হচ্ছিলাম। এক সঙ্গে একই বই তো পড়ি। অথচ এতো বড় বড় কথা তুই জানিস্ কি করে ?

সাগর বলল, উঃ, কতো কথাই যে প্রাণতোষবাবু জানেন। একবার বলতে আরম্ভ করলে আর শেষ হয় না। কতো দেশের গল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান কতো কি। কতক আধা আধা বুঝি। অনেক কথাই হেঁয়ালীর মতো মনে হয়। তবু কি ভালোই যে লাগে তাঁর কথা। মনে হয় হাঁ করে সব গিলি।

মনে মনে কেমন একটা দুঃখ অনুভব করলাম। প্রাণতোষবাবু প্রায়ই সাগরকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান। ভালো-মন্দ খাওয়ান। কতো সুন্দর কথা বলেন। কই আমাকে তো একদিনও ডাকলেন না? সাগরের সাথে অনেক দিন তাঁর কাছে গিয়েছি। কিন্তু কই? এমন সুন্দর করে করে গল্প তো তিনি করেন না আমাদের কাছে?

কিন্তু সে দুঃখ আমারি। সাগরের দিকে চেয়ে বললাম, সত্যি সাগর, প্রাণতোষবাবু তোকে খুবি ভালোবাসেন।

সাগর গভীর গলায় বললো, এতো ভালোবাসা আমি জীবনে পাইনি রে তরুণ। কি শুভক্ষণেই যে 'বিদ্যামন্দির' স্কুলে এসেছিলাম।

॥ ৪ ॥

কালের চাকা ঘুরে চলেছে স্বচ্ছন্দ গতিতে। ক্লাস ফাইভ, সিক্স, সেভেন। তিন বছরই বার্ষিক পরীক্ষায় সাগর ফার্স্ট, সুশীল সেকেণ্ড। নম্বরের তফাৎ একশোর বেশী। সুশীল আজও সখারামবাবুর প্রিয় ছাত্র। ভূগোলে সব চেয়ে বেশী মার্ক পায়। সাগর যথাপূর্ব প্রাণতোষবাবু ও শৈলেশবাবুর প্রিয় ছাত্র। সম্প্রতি হেডমাস্টার মশায়ও মুগ্ধ। ক্লাস সেভেনের বার্ষিক পরীক্ষায় ওর ইংরেজি খাতার আলোচনায় টিচার্স রুম মুখরিত হলো। প্রমোশন ডাকতে এসে হেডমাস্টারমশায় সাগরের নাম-ধাম-পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আর এক দফা সাগরের ইংরেজি লেখার প্রশংসা করে সগর্বে বললেন, সাগর ইজ দি ব্রাইটেস্ট স্টার ইন দি ফার্মামেণ্ট অব মাই টিচিং লাইফ।

সেই বছর থেকে রুটিনের পরিবর্তন হলো। থার্ড ক্লাসের ইংরেজি পড়াবার ভার নিলেন হেডমাস্টারমশায় নিজে। উদ্দেশ্য—ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইউনিভারসিটিতে ষ্ট্যাণ্ড করে সাগর যাতে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে, এখন থেকেই তার পথ পরিষ্কার করা।

প্রতিভার দীপ উজ্জ্বলতর হলো।

আরো অনেক দিকেই সাগরের নাম ছড়িয়ে পড়লো। স্কুলের টানা বারান্দায় একটি সাহিত্য-সভা বসে প্রতি পূর্ণিমা রাতে। সাগর তাতে মাঝে মাঝে কবিতা পড়ে। যারা শোনে, তারাই প্রশংসা করে। একটা কবিতার কয়েক লাইন আজো মনে আছে :

তরুণ!

নব অরুণ!

উচ্ছল রাঙা চরণে

এসো মরণ পথিকে তরণে ;
এসো মহানিশা-শেষ প্রভাতে ;
ভাঙো আলোর দুয়ার আঘাতে।

জেলার সমস্ত স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একটি রচনা প্রতিযোগিতা হলো। রচনার বিষয় : শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান ছাত্রসমাজ। প্রাণতোষবাবুর কথায় সাগর একটি রচনা পাঠালো। ফলাফল বের হলে দেখা গেল সাগর প্রথম স্থান অধিকার করেছে। পুরস্কার স্বরূপ অনেকগুলো বই এলো ওর নামে।

আর একদিন।

কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ এসেছেন জেলার শহরে। বিকালে টাউন হলের মাঠে তাঁর বক্তৃতা।

খবর শুনে মফঃস্বলে আমাদের মন হলো চঞ্চল। প্রাণতোষবাবুকে ধরে অনেক কষ্টে আয়োজন করলাম শহর যাত্রার। আগাগোড়া ট্রেনে যেতে অনেক খরচ। অতএব ব্যবস্থা হলো : আগের স্টেশনে নেমে মাইল খানেক পথ পায়ে হেঁটে খেয়া পার হয়ে শহরে পৌঁছব। অর্ধেক খরচে যাতায়াত হবে।

সবাই এ-প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হলাম। আপত্তি জানালো সাগর, আমাদের জন্যে এই ব্যবস্থাই থাক। কিন্তু আপনি স্যার ট্রেনেই যান।

কেন ?

—হেঁটে যেতে আপনার বড় কষ্ট হবে স্যার। দুপুরের কড়া রোদ।

প্রাণতোষবাবু হেসে বললেন, ভ্রমণের কষ্টেই তো তীর্থ দর্শনের আনন্দ বাড়ে। পথ হাঁটতে যে-কষ্ট পাবো, তোমাদের নিয়ে যেতে আনন্দ পাব তার চেয়ে অনেক বেশী।

অতএব এই ব্যবস্থাই ঠিক। আগের স্টেশনে নেমে হল্লা করে সবাই চললাম।

ঘাটে এসেই হলো বিপদ। খেয়া-নৌকো তখন যাত্রী নিয়ে ওপারে গেছে। ফিরে এসে তবে আমাদের পার করবে। অগত্যা একটা গাছতলায় প্রাণতোষবাবুকে ঘিরে সবাই বসলাম। আমাদের অনুরোধে প্রাণতোষবাবু আবৃত্তি করলেন কবিগুরুর 'আবির্ভাব' কবিতা।

কবিতা শেষ করে প্রাণতোষবাবু বললেন, কই হে সাগর, এবার তোমার পালা।

কোথায় সাগর?

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। খুঁজে দেখলাম, সাগর নেই। অনেক ক্ষণই ও দলছাড়া।

খোঁজ-খোঁজ। প্রাণতোষবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, এমন পাগল ছেলে। কোথায় যায়, কি করে। আরে, বাপু যাবি কোথায় তা বলে যা।

একটু পরেই সাগরের দর্শন মিললো। অনেক দূর হতে তীর ধরে ও উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সাগর বললো, শিগগির চলুন স্যার।

—কোথায়?

—পাট্‌নীর দেরী দেখে আমি স্যার এগিয়ে গিয়েছিলাম নদীর ধার দিয়ে। যদি কোন নৌকো পাই তো পারের ব্যবস্থা হবে। খানিক এগোতেই দেখি, এক সাহেব এসে নামলো গ্রীন-বোটে করে। আমি বলতেই সাহেব রাজী হয়েছে। চলুন স্যার, আমরা সবাই সাহেবের বোটে করে পার হতে পারব।

প্রাণতোষবাবু খুশি হয়ে বললেন, বলো কি? বলতেই সাহেব রাজী হলো?

হেসে জবাব দিলো সাগর, হ্যাঁ স্যার। ইংরেজিতে বললাম কি না সব কথা। ভারী খুশি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে আরো খুশি।

প্রিয় ছাত্রের কৃতিত্বে প্রাণতোষবাবু ততোধিক খুশি। চলতে চলতে শুধালেন, কি বললে তুমি রবীন্দ্রনাথের কথা?

—সেই যে কাল আপনি বলেছিলেন তাই : রবীন্দ্রনাথ ইজ দি আর্টিকুলেট সোল অব ইণ্ডিয়া।

এমনি কত কথা, কত ঘটনা। স্মৃতির পাতায় স্পষ্ট-অস্পষ্ট কত ছবি। হাসি-আনন্দে ভরা জীবনের উজ্জ্বল দিনগুলি। কে জানতো তখন, সামনে আছে ঝড়ের রাত!

কিছুদিন ধরেই সাগর অন্যমনস্ক। বিষণ্ণ। কেমন যেন উদাস ভাব।

নির্জনে পেয়ে একদিন সাগরকে জিজ্ঞেস করলাম, সব সময় এমন মন খারাপ করে থাকিস কেন রে সাগর? কি হয়েছে?

একটু চুপ করে থেকে সাগর জবাব দিলো, সত্যিরে, মনটা বড়ই চঞ্চল। কথাটা বলি বলি করেও তোকে বলা হয় নি। শোন্। আমি এখানে আর থাকব নারে?

চমকে উঠে বললাম, সে কি রে? কোথায় যাবি?

—কোথায় যাব তা ভাবি নি। হয় তো মামাবাড়ির গ্রামেই ফিরে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত।

—তোর কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না সাগর। কি হয়েছে আমাকে খুলে বল্।

সব কথা সাগর খুলেই বললো।

খুব ছোট বেলায়ই সাগরের বাবা-মা মারা যান। সেই থেকে ও মামাবাড়িতেই মানুষ। দিদিমা আগেই গত হয়েছিলেন। দাদা-মশায়ের স্নেহছায়ায়ই ওর শৈশব কাটে। তিনিও একদিন চোখ বুঁজলেন। মামা-মামীর বৃহৎ সংসারে দিনের পর দিন ও অবাঞ্ছিত গলগ্রহের মত ঝুলতে লাগলো।

কিন্তু সাগ্রহে ওকে কাছে টেনে নিলেন আর একটি মানুষ। গ্রামের মাইনর স্কুলের হেডমাস্টারমশায়।

বহুদর্শী মানুষ তিনি। আজীবন ছাত্র পড়িয়ে চুল পাকিয়েছেন। উঠন্তি মুলোকে তিনি পত্তনেই চিনে ফেললেন। অদ্ভুত প্রতিভাধর কিশোর সাগরের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন এক বিরাট সম্ভাবণার অংকুর।

তাঁরই আগ্রহে ও সযত্ন চেষ্টায়ই সাগর রেকর্ড মার্ক পেয়ে মাইনর পাশ করলো। তাঁরই সনির্বন্ধ অনুরোধে মামা ওকে যৎসামান্য খরচ দিয়ে শহরের হাই স্কুলে বোর্ডিংএ রেখে পড়াতে সম্মত হয়েছিলেন।

খুটিয়ে খুটিয়ে সব কথাই সাগর বললো আমাকে।

পরীক্ষার ফল জানতে পেরেই হেডমাস্টারমশায় স্কুল থেকে সোজা ছুটে এসেছিলেন ওর মামার কাছে। রাস্তা থেকেই সোল্লাসে চীৎকার করে বললেন, কইরে, সাগর কোথায়?

বাইরের ঘরে বসেছিলেন মামা। তিনি সাড়া দিতেই হেডমাস্টারমশায় বললেন, এই যে গুপ্তমশায়, ভাল করে একটা ভোজের ব্যবস্থা করুন এবার।

মামা প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি মাস্টারমশায়? হঠাৎ ভোজের ফরমাস কেন? কি হয়েছে?

ঘরে ঢুকে ফরাসে বসতে বসতে হেডমাস্টারমশায় বললেন, আর কি হয়েছে? সাগর পরীক্ষায় আমাদের জেলার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে। রেকর্ড মার্ক পেয়েছে।

মামা বললেন, বলেন কি মাস্টারমশায়! জেলার মধ্যে একেবারে ফার্স্ট হয়েছে! সাগর—ওরে সাগর—

হেডমাস্টারমশায়ের গলা শুনেই সাগর বেড়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো। আনন্দে ও উত্তেজনায় ওর বুকের ভিতরটা তখন

ধবক্ ধবক্ করছিলো। কি যে করবে ভেবেই পাচ্ছিলো না। মামার ডাকে কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। হেডমাস্টার-মশায় ও মামাকে প্রণাম করলো।

হেডমাস্টারমশায় মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তুই আমার মুখ রেখেছিস্ বাবা, তুই আমার স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছিস্। আমি আশীর্বাদ করছি, তুই বড় হবি—অনেক বড় হবি।

আশীর্বাদ-আপ্যায়নের পালা শেষ হলে হেডমাস্টারমশায় বললেন, এবার তাহলে সাগরের পড়ার ব্যবস্থা করুন গুপ্তমশায়। কোথায় পড়াবেন বলুন, জেলা শহরের সরকারী স্কুলে, না অন্য কোথায়ও ?

মামার সব আনন্দ যেন হঠাৎ চুপসে গেলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, সেইটেই তো পরম সমস্যা মাস্টারমশায়। আপনি তো সবই জানেন। ছা-পোষা মানুষ। টুকটাক কবরেজি করে কোন মতে সংসার চালাই। এতদিন আপনার দয়ায় স্কুলে ফ্রি-তে ঘরের খেয়ে পড়ছিলো। কোন রকমে চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু শহরের স্কুলে বোর্ডিংএ রেখে ওকে পড়াব সে ক্ষমতা কি আর ভগবান আমাকে দিয়েছেন ?

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মামা।

সে নিশ্বাস যেন সর্বধ্বংসী ঝড়ের মত সাগরের পাঁজরে এসে লাগলো। শেষে এই করলে ভগবান! পড়াশুনা, সাধ, স্বপ্ন—সব এখানেই শেষ হয়ে যাবে ?

হেডমাস্টারমশায় কিন্তু জিদ ধরলেন। বাধা দিয়ে বললেন, ও কি কথা গুপ্তমশায় ? সোনার টুকরো ছেলে। ও যে আপনার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তাছাড়া আপনার সামর্থ্য-অসামর্থ্যের কথা ভাবছেন কেন ? জেলার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে যখন, স্কলারশিপ ও একটা পাবেই এ তো জানা কথা।

মামা তবু ঢোক গিলে বললেন, তা না হয় পাবে। কিন্তু তাতেই

তো আর সব খরচ কুলোবে না। জেলার সরকারী স্কুলের বোর্ডিং-এর খরচ। সে যে অনেক টাকার ব্যাপার মাস্টারমশায়।

হেডমাস্টারমশায় এবার রেগে গেলেন, তাই বলে ছেলেটার পড়া হবে না? আপনার নিজের ছেলে হলে তাকে কি আপনি পড়াতেন না?

মামা মাথা নীচু করে বললেন, আপনি অকারণেই আমার উপর রাগ করছেন মাস্টারমশায়। ছেলে-ভাগ্নের তো কথা নয়, কথা হলো সাধ্যের। সাধ তো যায়ই। কিন্তু চাঁদের দিকে হাত বাড়ালেই কি চাঁদ ধরা যায়?

হেডমাস্টারমশায়ের তবু সেই এক কথা, ও সব আজে-বাজে কথা আপনি তুলে রাখুন গুপ্তমশায়। ওর পড়ার একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে। ধার করে হোক, কর্জ করে হোক, যেমন ক'রে হোক। আরে মশায়, আজ আপনি সংসারের কথা ভাবছেন, তুদিন পরে ওই ছেলে যখন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে চেয়ারে বসবে, তখন তো আপনিই পায়ের উপর পা রেখে গুড়গুড়ি টানবেন। ওর তো আর মাথার উপরে আর কেউ নেই। বাপ বলতেও আপনি, মামা বলতেও আপনি।

অনেক কথা কাটাকাটির পর মামা নিমরাজী হলেন। স্থির হলো জেলা শহরের সরকারী স্কুলে নয়, সেখানে অনেক খরচ, তার চেয়ে 'বিদ্যামন্দির' স্কুলই ভাল। জমিদারের স্কুল। বোর্ডিংএর খরচ যৎসামান্য। তাছাড়া সেখানকার হেডমাস্টারমশায়ও এ হেডমাস্টার-মশায়ের পরিচিত। তাঁর একটা চিঠি নিয়ে গেলে অল্প খরচে খাওয়া-পড়ার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়ে যাবে।

হলোও তাই। 'বিদ্যামন্দির' স্কুলেই সাগর ভর্তি হলো। নানা বিঘ্ন-বাধা, সুখ-তুঃখের ভিতর দিয়ে কয়েকটা বছর কেটেও গেলো। কিন্তু আর চলবে না। এবার সাগরকে ফিরে যেতে হবে। পিছনে

পড়ে থাকবে সব আশা, সব স্বপ্ন। সব ফেলে ওকে চলে যেতে হবে।

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু কেন যেতে হবে সেই কথাটাই তো বললি না খুলে। কি এমন হয়েছে যার জন্যে তোকে চলে যেতেই হবে?

একটু চুপ করে থেকে ধরা গলায় সাগর বললো, মামা মারা গেছেন।

—সে কিরে? কবে?

—দিন কয়েক হলো। কিছুদিন যাবৎই মামার শরীরটা ভাল যাচ্ছিলো না। তার উপর বয়সও হয়েছিলো।

সংবাদটা শুনে আমিও যেন কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। এর পর কি যে বলব বুঝতে পারছিলাম না। আপনা থেকেই এক সময়ে মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো, তাহলে এখন তুই কি করবি?

সাগর মাথা নীচু করেই জবাব দিলো, কি যে করব ঠিক জানি না।

আমি বললাম, পড়াশুনা ছেড়ে দিবি?

—তাছাড়া আর উপায় কি বল্? স্কুলে না হয় ফ্রি-তে পড়ি। কিন্তু বোর্ডিংএ থাকতে তো খরচ লাগে। এত দিন কষ্টেস্থষ্টে যেমন করে হোক মামাই খরচটা চালাচ্ছিলেন। তিনিও চলে গেলেন। কাজেই—

কথাটা সাগর শেষ করতে পারলো না। উদ্গত অশ্রুর আঘাতে কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে গেলো।

চেয়ে দেখলাম, ওর ঠোঁট দুটি কাঁপছে। দুটি চোখ অশ্রু-ছলছল। আর কোন কথা বলতে পারলাম না। চুপ করে বসে রইলাম দুজন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে 'বিদ্যামন্দির' স্কুল-বাড়িটা ঝাপসা হয়ে এলো।

সারা রাত সাগরের কথাই ভাবলাম।

এমন ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে, অথচ সামান্য কটা টাকার জন্য ওর পড়া-শুনা বন্ধ হয়ে যাবে ? এত বড় একটা প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটবে ? আর সে প্রতিভা আমার অত্যাগসহন বন্ধু। অথচ আমি তার কোন প্রতিকারই করতে পারব না ?

অসহায় বেদনায় সারা রাত ছটফট করলাম।

পরদিনই কথাটা প্রাণতোষবাবুর কানে তুললাম।

স্কুলের ছুটির পর তিনি একাই বাড়ি যাচ্ছিলেন 'অনন্দ সাগর'-এর তীর ধরে।

এগিয়ে যেয়ে নমস্কার করে কুণ্ঠিত গলায় বললাম, একটা কথা ছিলো স্যার।

ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতেই তিনি বললেন, কি কথা বলো।

—আজ্ঞে, সাগর স্কুল ছেড়ে দেবে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন প্রাণতোষবাবু। ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কেন ? কি হয়েছে তার ?

সব কথা বললাম। গুম হয়ে খানিক ভাবলেন তিনি। দেখতে দেখতে গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠলো। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠদ্বয়ে ফুটে উঠল একটা দৃঢ়সংকল্পের আভাষ।

কিছুক্ষণ পরে শুধু একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন—হুম্।

তারপর এক সময়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, কাল স্কুলের পরে সাগরকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।

পরদিন স্কুলের পরে সাগর টিচার্স রুমে প্রাণতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলো। তিনি বললেন, তুমি বাইরে একটু অপেক্ষা কর সাগর। আমি এখুনি বেরুব। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি দুজন এগিয়ে চললো পুকুরের পার দিয়ে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে আলো-ঝিল্‌মিল্‌ 'অনন্ত সাগর'-এর নীল জল। বাঁধানো ঘাটের পাশে কয়েকটা রাজহাঁস খেলা করছে।

নীরবেই দুজন পথ হাঁটতে লাগলো। কারো মুখে কোন কথা নেই।

এক সময়ে প্রাণতোষবাবু বললেন, তরুণের কাছে সব কথাই আমি শুনেছি।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। পুকুর ছাড়িয়ে এবার ওরা রাজবাড়ির বাগানের ভিতরকার পথে পা দিলো।

প্রাণতোষবাবু বললেন, ও পাশের ওই মাঠটায় চলো। একটু বসব সেখানে।

প্রাণতোষবাবু ডাইনে পা বাড়ালেন। সাগর নীরবে তাঁকে অনুসরণ করলো।

সবুজ ঘাসে ঢাকা সুন্দর ছোট মাঠটি। তিনদিকে লাল সুরকি ছাওয়া পথ। পথের পাশে কয়েকটা ঝাকরা ডালপালা মেলে দেওয়া গাছ। তারি একটার নীচে বসলেন প্রাণতোষবাবু। সাগরকেও বসতে বললেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সাগর বসলো তাঁর পাশে। বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি মেলে তাকালো তাঁর গম্ভীর মুখের পানে।

প্রাণতোষবাবুই প্রথম কথা বললেন, তুমি নাকি পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে মামাবাড়ির গাঁয়ে ফিরে যাবে ঠিক করেছ?

মাথা নীচু করে সাগর জবাব দিলো, সবই তো আপনি শুনেছেন স্যার।

—হুঁ, শুনেছি। বলেই থামলেন প্রাণতোষবাবু। খানিক পরে আবার প্রশ্ন করলেন, পড়াশুনাটা চলুক এটা কি তুমি চাও না?

প্রশ্ন শুনে সাগর মুখ তুলে তাকালো। বললো, চাই তো খুবই। কিন্তু উপায় কি?

প্রাণতোষবাবু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, হয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে। দেখো সাগর, লাইফ ইজ নট এ বেড অব রোজেস্‌। চলার পথে বিঘ্ন-বাধা তো থাকবেই। তাই বলে পা গুটিয়ে বসে

থাকলে কি চলে? বিশেষতঃ তোমার মত ছেলের। তোমার উপর স্কুলের যে অনেক ভরসা।

প্রাণতোষবাবুর কথায় যেন নতুন আশার আলো দেখতে পেলো সাগর। অর্থহীন কথা আর উপায়হীন উপদেশ শোনাবার লোক তিনি নন। নিশ্চয় সাগরকে এই সংকট থেকে বাঁচাবার একটা পথ তিনি স্থির করেছেন। সাগর বললো, বেশ তো, আপনিই বলে দিন এ অবস্থায় আমি কি করব?

প্রাণতোষবাবু বললেন, তুমি কি আমার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতে পারো না?

—আপনার বাড়িতে থেকে?

আনন্দ ও উত্তেজনা ঝরে পড়লো সাগরের কণ্ঠ থেকে। প্রাণতোষবাবু ওকে নিজের কাছে রাখতে চাইছেন! স্কুলে ও থাকবে এই দেবতুল্য লোকটির কাছে, সকাল সন্ধ্যায় বাড়িতেও থাকতে পারবে তাঁর পাশে, এ যে ওর কাছে স্বর্গ পাওয়ার চেয়েও বেশী।

প্রাণতোষবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

সাগর উত্তেজনায় স্খলিত কণ্ঠে বললো, না স্যার, আপত্তির আর কি থাকতে পারে। তবে—

সাগর কথাটা শেষ না করেই মাঝপথে থেমে গেলো।

প্রাণতোষবাবু উৎকণ্ঠিত ভাবে বললেন, তবে কি বলো?

সাগর মাথা নীচু করে থেমে থেমে বললো, আমার মত একটি সহায়হীন ছেলেকে আপনি অত্যন্ত স্নেহ করেন সেই তো আমার পরম সৌভাগ্য। তারপর উপর আবার আপনার উপর এতটা বোঝা চাপানো—

বাধা দিলেন প্রাণতোষবাবু। ধমকের সুরে বললেন, বোঝাটা যখন আমার ঘাড়েই চাপবে তখন সেটা ছোট কি বড় সে বিচারের ভারটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও। দেখো সাগর, উঠতি বয়স

তোমাদের। আত্মমর্যাদা জ্ঞানটা এ বয়সে একটু বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। তবু বলছি, যারা তোমার হিতকামী, যারা তোমার চেয়ে বড়, তাদের বিচার-বুদ্ধি ও স্নেহ-ভালবাসার মূল্য দিতে কৃপণতা করাটাও অন্যায়।

প্রাণতোষবাবুর কথার সুরে সুরে সাগরের মন খুশিতে গান গেয়ে উঠলো।

'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে।'

তবু নিজের বক্তব্যের জের টেনেই ও বললো, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না স্যার। আপনার আজ্ঞা আমার কাছে সব সময়ই শিরোধার্য। আমি শুধু আমার দিকের কথাটা আপনাকে জানাতে চাই। আপনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তাই নিয়ে স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে এমন কি শিক্ষকমশায়দের মধ্যে পর্যন্ত কত রকম আলোচনা হয় সে তো আপনি জানেন। বাড়িতে তো আপনি একা নন। আপনার ভাইরা রয়েছেন, অন্য সবাই আছেন। আপনার কাছে যাই হই তাদের চোখে আমি একটি আশ্রয়হীন পরগাছা মাত্র। আমাকে নিয়ে আপনার পরিবারে একটা অশান্তির সৃষ্টি হোক, এটা তো আপনার আমার কারো পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রাণতোষবাবু চুপ করে নিবিষ্ট মনে ওঁর কথাগুলো শুনছিলেন। একটু বিরক্তি বোধ যে না করছিলেন তা নয়। এক কথার মানুষ তিনি। চিরকুমার সন্ন্যাসীকল্প মানুষ। আদর্শবাদী। সাগর এক কথায়ই তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হবে এই তিনি চেয়েছিলেন। তবু একটি কিশোর মানুষের এই গভীর সাংসারিক জ্ঞান, তীক্ষ্ণ মর্যাদাবোধ এবং আসন্ন সংকটের মুখে দাঁড়িয়েও অচঞ্চল স্থির বাকভঙ্গী তাঁকে সত্যিই চমৎকৃত করেছে।

মাথা নেড়ে তিনি বললেন, তোমার শেষের আশংকাটা হয়তো একেবারে ভিত্তিহীন নয়। আমার সংসারের মানুষদের আমি চিনি। ছুটো ভাই-পোর মধ্যে একটি তো তোমাদের সঙ্গেই পড়ে। তার

চরিত্র তোমার অজানা নয়। বাপের ধারাই ওরা পেয়েছে। অথচ হাত ধরে লেখাপড়া ওদের আমিই করিয়েছি। আজও করাই। তাই তো ভাবি সাগর, মানুষের জীবন একান্ত ভাবেই জন্মগত সংস্কারের বশ। নইলে ওরা আমার বাড়ির ছেলে। জন্ম থেকেই ওদের কোলে-পিঠে করে আমি মানুষ করতে চাইলাম। হলো কৈ ? আর তুমি কোথাকার কে ? জানা নেই শোনা নেই, স্কুলের পাঁচশো ছেলের মধ্যে একজন মাত্র। অথচ তোমার জন্যই দিন রাত আমার উৎকণ্ঠার অন্ত নেই।

কথাগুলো শুনতে শুনতে সাগরের দুই চোখ জলে ভরে এলো।

সেদিন সন্ধ্যায় বোর্ডিংএ ফিরে এসে এই আনন্দ-সংবাদ আমাকে সবিস্তারে শোনাতে বসে কতো যে আনন্দের অশ্রু সাগরের চোখ থেকে ঝরেছিলো সে কথা স্মরণ করে আজও বিস্ময়ের আমার অবধি নেই। দুটি ভিন্ন বয়সের অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে এমন গভীর আত্মীয়তা, প্রাণে প্রাণে এমন মধুর মিলনের কথা যে আমার কল্পনায়ও ধরা দেয় না। জীবনে তো অনেক মানুষ দেখলাম, অনেক বিরহ-মিলন-খেলা খেললাম, কিন্তু এমনটি তো কই আর কখনও আর কোথাও দেখলাম না!

কিন্তু আমার কথা থাক। সাগরের কথাই বলি।

মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রাণতোষবাবুর কথাগুলো শুনতে শুনতে সাগরের মন যেন পাখা মেলে দিলো নীল আকাশের পানে।

এত আনন্দ, এত মধুও কি আছে জীবনে! প্রাণতোষবাবু ওকে স্নেহ করেন, আদর করেন, সেটা ওর অজানা নয়। কিন্তু সংসারবিরাগী এই শান্ত সৌম্য মানুষটি যে কখন কোন্ পথে ওর মনের একেবারে মণিকোঠায় পদার্পণ করে বসেছেন, ওকেই করেছেন নিজের মনো-রাজ্যের একমাত্র আশ্রয়স্থল, এ কথা যে ওরও কল্পনার বাইরে ছিলো এতদিন।

ধীরে ধীরে প্রাণতোষবাবুর দুই পায়ের উপর মাথা রেখে তাঁকে প্রণাম করলো সাগর।

ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে পরম স্নেহে প্রাণতোষবাবু বললেন, উচ্ছ্বাসের মাথায় অনেক কথা তোমাকে বলে ফেললাম। কথাগুলো না বললেই বোধ হয় ভাল হতো। যাহোক, তুমি আমার বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা চালিয়ে যাও। এ বাড়িতে মাঝে মাঝে ছোটখাট লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হয় তো তোমাকে সইতে হবে। কিন্তু জীবনের রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একেবারে অক্ষত অবস্থায় তুমি জয়লাভ করবে, কোন অস্ত্রাঘাত তোমার দেহকে রক্তাক্ত করবে না, এ তো হতে পারে না। কাজেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা যাই পাও তাকে জীবনের অনিবার্য পাওনা বলেই গণ্য করো। আর একটা কথা সব সময় মনে রেখো, আমি সর্ব অবস্থায়ই তোমার পিছনে আছি। আমার একটি ছেলে থাকলে যেমন ভাবে তার পিছনে থাকতাম ঠিক তেমনি ভাবেই।

সাগর মুখ তুলে চাইলো। ওর সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে আনন্দের অসহ্য উত্তেজনায়।

আর একবার প্রাণতোষবাবুর পায়ের উপর মাথা রেখে কম্পিত গলায় ও ডাকলো, বাবা—বাবা!

প্রাণতোষবাবুর দুই নেত্র স্থির উদাস—দূর আকাশে নিবদ্ধ।

॥ ৫ ॥

> 'শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
> প্রচারিল 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
> তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
> যেতে দিতে হল।'

এই এক বিস্ময়কর ট্র্যাজিডি মানুষের জীবনের। যাকে কাছে রাখতে চায়, হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা দিয়ে যাকে জড়িয়ে ধরে, যার বিরহে জীবন মরুভূমি বলে মনে হয়, তাকেই একদিন যেতে দিতে হয়।

সাগরকেও একদিন যেতে হলো। প্রাণতোষবাবুর স্নেহ-বন্ধন তার গতিরোধ করতে পারলো না।

একদিন সকালে। বেলা প্রায় ন'টা বাজে।

সাগর পড়ার ঘরে গলা ছেড়ে জ্যামিতি পড়ছে। প্রাণতোষবাবুও বারান্দায় বসে ছেলেদের অনেকগুলো টাস্কের খাতা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো, গতকাল দুপুরে বৃষ্টির পরে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরবার পথে জুতোজোড়া কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে আছে। আজ সকাল থেকেই বেশ রোদ উঠেছে। জুতোজোড়াটা ঝেড়েপুছে পরিস্কার করে একটু কালি করা দরকার।

টাস্কের খাতাগুলোর দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকালেন একবার। না, এখন জুতো নিয়ে বসলে খাতাগুলো দেখা আর হবে না আজ।

সাগরের পড়ার ঘরের দিকে একবার তাকালেন। জোরালো

গলার পড়ার শব্দ ভেসে আসছে। তার পড়ায়ও বাধা দিতে ইচ্ছে হলো না। অগত্যা বাইরের বাগানের দিকে দৃষ্টি ফেলে উঁচু গলায় হাঁক দিলেন, পণ্টু—

পণ্টু তাঁর বড় ভাই-পো। সাগরের সঙ্গে এক ক্লাসেই পড়ে। শ্রীমানের পড়াশুনার পাট অনেকক্ষণ চুকে গেছে। বাগানে কি একটা গাছ পুতে তাতে জল দিচ্ছিলো। প্রাণতোষবাবুর ডাকে সাড়া দিয়ে বললো, যাই জেঠামশায়।

প্রাণতোষবাবু ঘরের বারান্দায় বসেই খাতা দেখছিলেন। পণ্টু এসে দাওয়ার পাশে দাঁড়াতেই বললেন, বাবা পণ্টু, আমার জুতো জোড়াটা একটু পরিস্কার করে কালি করে দাও তো।

—দিচ্ছি জেঠামশায়, বলে পণ্টু এক লাফে বারান্দায় উঠে জুতো রাখবার জায়গার দিকে এগিয়ে গেলো।

প্রাণতোষবাবু তার দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বললেন, আর দেখো, সেই সঙ্গে সাগরের জুতো জোড়াটাতেও একটু ব্রাশ করে দিও। ও এখনো পড়ছে, তাই বলছি।

পণ্টুর মুখখানা হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। যেতে যেতেই সে থমকে দাঁড়ালো।

সাগর আসার পর থেকেই প্রাণতোষবাবুর ছোটখাট কাজগুলো সাগরই করে দেয়। এতে কি পণ্টু কি বাড়ির অন্য লোকজন সবাই একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। কোথাকার কে এক হা-ভাতে ছেলে সে এসে প্রাণতোষবাবুর সবখানি স্নেহের আসন দখল করে বসেছে, বাড়ির ছেলেগুলো তাঁর কাছে পর হতে বসেছে, এটাকে কেউই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারে নি।

তাই আজ যখন প্রাণতোষবাবু পণ্টুকে ডেকে একটা কাজের ভার দিলেন তখন সে বেশ খুশিই বোধ করছিলো। কিন্তু তাই বলে সাগরের জুতোও পরিস্কার করে দিতে হবে?

পণ্টু কুণ্ঠিত ভাবে প্রাণতোষবাবুর দিকে ফিরে তাকালো। কিন্তু

তিনি তখন খাতায় মন দিয়েছেন। অগত্যা পণ্টু একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছজোড়া জুতো নিয়ে উঠোনে যেয়ে বসলো।

পণ্টুর বাবা মনতোষবাবু পাশের ঘরে থেক সবই শুনছিলেন, দেখছিলেন। তিনি এবার প্রাণতোষবাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের মনেই বলতে লাগলেন, জেঠামশায় গুরুজন, তাঁর জুতো ও পরিস্কার করবে—একশো বার করবে। কিন্তু তাই বলে কোথাকার কে তার জুতো ওকে দিয়ে পরিস্কার করানোটা ঠিক নয়। ওরা যদি এতে অপমান বোধ করে তাহলে ওদের দোষ দেওয়া যায় না।

কথাগুলো প্রাণতোষবাবু শুনলেন। হাতের পেন্সিল তুলে চুপ করে রইলেন কয়েক মিনিট। তারপর খড়মে পা গলিয়ে উঠোনে নামলেন।

পণ্টুর কাছে যেয়ে বললেন, পণ্টু, তুমি বরং আমার খাতাগুলো গুছিয়ে রেখে মাত্বরটা তুলে ফেলো গে। জুতোটা আমিই পরিস্কার করছি।

পণ্টু আপত্তি জানালো, না না জেঠামশায়, এ আমি এখুনি করে দিচ্ছি।

প্রাণতোষবাবু মৃত্ব অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, যা বলছি তাই করো। খাতাগুলো গুছিয়ে রাখো গে।

জেঠামশায়ের স্বভাব পণ্টু ভাল ভাবেই জানে। তাঁর হাঁ কে না করা বড় সহজ নয়। জুতো রেখে সে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলো।

প্রাণতোষবাবুর শেষের কথাগুলো কানে যেতেই সাগরও বেরিয়ে এসেছিলো পড়ার ঘর থেকে। উঠোনে নেমে বললো, এ আপনি কি করছেন? আমাকে ডেকে বললেন না কেন?

প্রাণতোষবাবু জুতোর কাদা মুছতে মুছতেই বললেন, তুমি পড়ছিলে তাই আর তোমাকে ডাকি নি।

সাগর বললো, পড়া আমার হয়ে গেছে। আপনি উঠুন। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

হঠাৎ নিজের জুতোর দিকে নজর পড়তেই সাগর সসব্যস্তে বলে উঠলো, ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কি করেছেন বলুন তো ? আমার জুতো কি আমি নিজে পরিস্কার করে নিতে পারতাম না ? নিন, উঠুন। আপনার এটুকু কাজও কি আমি করে দিতে পারি না ?

সাগরের স্বরে অভিমান ও অনুযোগ। প্রাণতোষবাবু আর দ্বিরুক্তি করলেন না। জুতো রেখে ধীর পায়ে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন।

সাগর খুশি মনে তাঁর জুতোয় ব্রাশ চালাতে লাগলো।

ব্যাপারটা কিন্তু সেখানেই মিটলো না।

বিকেলে সাগর একটু আগেই বাড়ি ফিরলো। প্রাণতোষবাবুর অনেক দিনই ফিরতে দেরি হয়। স্কুলের নানা কাজকর্মে আটকা থাকেন। সেদিনও ছিলেন।

কয়েক দিনের ছিঁচকে বৃষ্টির পর খটখটে রোদ উঠেছে। ঝকঝকে নীল আকাশ। পড়ন্ত বিকেলেও সারা উঠোনে রোদের ছড়াছড়ি।

জামাকাপড় ছেড়ে কুয়োতলার দিকে যাচ্ছিলো সাগর। ও-পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মনতোষবাবু।

গলায় একটা হুকুমের আমেজ এনে বললেন, দেখো সাগর, সন্ধ্যার পরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটু বেরুব ভাবছি। অথচ কদিনের জল-কাদায় জুতোগুলো একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে আছে। আমারও সময় নেই যে পরিস্কার করি। এক্ষুনি আমাকে বেরুতে হচ্ছে একটা কাজে। কাজেই রোদ থাকতে থাকতে তুমিই জুতোগুলো সব পরিস্কার করে রেখো।

সাগরের জবাবের জন্য কোন রকম অপেক্ষা না করেই ছোট ছেলে বিন্টুকে ডেকে বললেন, এই বিন্টু, ঘর থেকে জুতোগুলো সব বের করে দেতো। তোদের সাগরদাই সব পরিস্কার করে দেবে।

ছোট-বড় নানা সাইজের কয়েকজোড়া কর্দমাক্ত ময়লা জুতো বের করে দিলো বিন্টু।

সেদিকে চেয়ে সাগর বিরস মুখে বললো, কিন্তু আমি যে একটু খেলতে যাব ভেবেছিলাম কাকাবাবু।

মনতোষবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, কাজ ফেলে যে খেলা করা যায় না, আশা করি সেটা বুঝবার মত বয়স তোমার হয়েছে। একটা সংসারে থাকতে হলে তার ভাল-মন্দর সঙ্গে জড়িয়েই থাকতে হয়। আমি চললাম। কাজটা যেন ঠিক মত করা হয়।

কথাগুলো বলতে বলতেই মনতোষবাবু হন্‌হন্‌ করে বাইরে চলে গেলেন।

তাঁর পথের দিকে খানিক চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো সাগর। সকালবেলাকার জুতা-পালিশ-পর্বের কথাটা মনে পড়লো। এটা যে তারি পাল্টা জবাব সেটা বুঝতে একটুও বিলম্ব হলো না বুদ্ধিমান সাগরের।

ছুই ঠোঁটে একটা ম্লান হাসি টেনে কাঁধের গামছাটা কোমরে বেঁধে জুতো-ব্রাশ নিয়ে উঠোনে বসলো সাগর। জুতোর কাদা ছাড়িয়ে তাতে ব্রাশ ঘসতে লাগলো।

খানিক পরেই বাড়িতে ঢুকলেন প্রাণতোষবাবু।

সাগরকে দেখে বললেন, অবেলায় জুতো নিয়ে বসেছ কেন সাগর? ও তো কাল সকালে করলেই হতো।

নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি ব্যথা-ছলছল হয়ে উঠেছিলো ছুটি চোখ। প্রাণপনে মনের সে ভাবকে চাপা দিয়ে সাগর বললো, কাকাবাবু বলে গেলেন আজ সন্ধ্যায়ই কোথায় বেড়াতে যাবেন তাই—

জুতোগুলোর উপর ভাল করে দৃষ্টি পড়লো প্রাণতোষবাবুর। কঠিন কণ্ঠে তিনি বললেন, তাই বাড়িশুদ্ধ সকলের জুতোর বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে? তাও এই অবেলায়? একটু আক্কেল নেই তার?

সাগর প্রমাদ গুণলো। প্রাণতোষবাবু একরোখা মানুষ। এই নিয়ে না একটা হট্টগোল বাঁধিয়ে বসেন, এই তার ভয়। শেষে কি

ওর জন্য একটা ভ্রাতৃবিরোধ হবে? শুরু হবে একটা পারিবারিক গোলযোগের?

সাগর বললো, তাতে আর কি হয়েছে? কোথাও যাবেন হয়তো, তাই আমাকে বলেছেন। আমিও তো বাড়িরই ছেলে। এতো আমারই কাজ।

—বাড়ির ছেলে! তা মনে করলে তো কোন কথাই ছিলো না। আসলে এ হলো আমাকে একটু শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা। সে কি আর আমি বুঝি না। কোথায় মনতোষ? এখনি এর একটা ফয়সালা হয়ে যাক যে এ-বাড়ির কর্তা কে—আমি না সে।

ঝোঁকের মাথায় হয় তো আরো অগ্রসর হতেন প্রাণতোষবাবু। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে সাগর দাঁড়ালো তাঁর সামনে। দৃঢ় অথচ সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললো, আপনি চুপ করুন। এ নিয়ে কোন হাঙ্গামা আপনি করতে পারবেন না।

—তবে কি আমি পড়ে পড়ে মার খাব তাই তুমি চাও?

—আমি কি চাই না চাই সে কথা পরে হবে। এখন আপনি ঘরে যান। জামা-জুতো ছাড়ুন। বিশ্রাম করুন। জুতোগুলো শেষ করে আমি এখুনি যাচ্ছি।

প্রাণতোষবাবু আর কোন কথা বললেন না। ধীর পায়ে উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন।

কিছুক্ষণ পরে সাগরও যেয়ে ঢুকলো তাঁর ঘরে। তারপর এক সময় দুজনেই বেরিয়ে গেলেন মাঠের পথে।

নীরবে দুজনে হাটতে লাগলেন। কারো মুখে কোন কথা নেই।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো সাগর, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

—কিসের ক্ষমা সাগর?

চমকে প্রশ্ন করলেন প্রাণতোষবাবু।

—আপনার কথার উপর তখন কথা বলেছি, সেটা তো আমার ধৃষ্টতা।

—না। সেটা পুত্রের কর্তব্য। তুমি ঠিকই করেছ। রাগের মাথায় আমিই ভুলে গিয়েছিলাম যে এ নিয়ে হৈ-চৈ আমি যত বেশি করব তোমার লাঞ্ছনা ততই বাড়বে। আমার উপর যত আক্রোশ ওদের সব যেয়ে পড়বে তোমার উপরে।

সাগর আর কোন কথা বললো না। নীরবে হাঁটতে লাগলো প্রাণতোষবাবুর পাশে পাশে।

আবার কথা বললেন তিনি, অমি শুধু ভাবছি সাগর, এ অন্যায়ের প্রতিকার হবে কেমন করে? আর তুমিই বা পড়ে পড়ে কত মার খাবে?

সাগর বললো, সেদিন তো আপনিই বলেছিলেন, জীবনের রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অক্ষত দেহে জয়লাভ করা যায় না। অস্ত্রাঘাত কিছু লাগবেই দেহে। রক্তও ঝরবে।

গভীর স্নেহে বলে উঠলেন প্রাণতোষবাবু, এই কথাটাই তুমি সব সময় মনে রেখো বাবা। আরো মনে রেখো, যত রক্তই ঝরুক তোমার দেহে, আমার স্নেহের পরশ তাতে থাকবেই থাকবে।

—আমি জানি। তাই তো আপনাকে বলছি, সংসারের ছোট-খাট ঝামেলা নিয়ে আপনি নিজেকে বিব্রত করবেন না। আপনার স্নেহের জন্য ওটুকু লাঞ্ছনা আমি হাসিমুখেই সইতে পারব।

হায়রে! তখন কি সাগর একবারও ভাবতে পেরেছিলো যে যে-অহংকারের বশে মানুষ নিজেকে সর্বক্ষম বলে মনে করে তা কত ঠুনকো! প্রতিকূল হাওয়ার একটা ধাক্কায় তা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

তাই যদি না হবে তাহলে প্রাণতোষবাবুর এত স্নেহ, এত বিশ্বাস ঝড়ের একটা ধাক্কায় এমন ছিন্নমূল বিটপীর মত ধূলায় গড়িয়ে পড়লো কেন?

কেন সাগরের এত অহংকার, এত ভালবাসা সব অসহায়ের মত তাকে পথ ছেড়ে দিলো ?

কেন সাগর নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো ?

প্রাণতোষবাবুর কনিষ্ঠ ভাইয়ের শ্বশুর এসেছেন জামাই বাড়ি বেড়াতে। কেমন করে তাঁর কোটের পকেট থেকে পাঁচ টাকার একখানি নোট গেলো উধাও হয়ে।

প্রথম কুটুমবাড়ি এসেছেন। চক্ষু লজ্জায় তিনি কথাটা বললেন না কাউকে। কিন্তু কথায় কথায় সবই বেরিয়ে পড়লো।

বাড়িময় হৈ-চৈ। ছিঃ ছিঃ, নতুন কুটুম। তাঁর পকেট থেকে নোট চুরি ! লজ্জায় সকলের মাথা কাটা যেতে লাগলো।

শ্বশুরমশায় যতো বলেন, আহা যাক্ যাক্ পাঁচটা টাকাই তো। সকলে ততোই ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন, আজ্ঞে না, টাকার কথা শুধু নয়। এ যে মান-মর্যাদার কথা। একটা হিল্লে এর করতেই হবে।

বিকেল বেলা। স্কুল থেকে ফিরে সাগর উঠোনে পা দিয়েই দেখে বাইরের ঘরে অনেক লোকের জটলা। বাড়ির ছেলে-বুড়ো অনেক। আশে-পাশের লোকও রয়েছে। এদিকে-ওদিকে কয়েকটা খোলা সুটকেস, তোরঙ্গ।

সাগরকে দেখেই ছেলেমেয়েরা কলরব করে উঠলো, এই যে সাগরদা এসেছে। এসো সাগরদা, এবার তোমার পালা।

মনতোষবাবু গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিলেন, তোমার সুটকেসটা নিয়ে এসো সাগর, সকলের সামনে একবার খুলে দেখাও।

দপ্ করে সাগরের রক্তে আগুন জ্বলে উঠলো। সমস্ত শরীর জ্বালা করতে লাগল তীব্র দহনে। শুধু ছোট একটা প্রশ্ন করলো, কেন ?

—তালই-মশায়ের কোটের পকেট থেকে পাঁচটা টাকা পাওয়া যাচ্ছে না কাল সকাল হ'তে—

—আপনার কি ধারণা, সে টাকা আমি চুরি করেছি ?

—না ঠিক তা নয়। সে-রকম ছেলে মনে করলে তোমাকে আমরা বাড়িতে থাকতে দিতাম না।

সত্যি তো, সাগর এ-বাড়ির কেউ নয়। আশ্রিত কুকুরের সমান তার মর্যাদা এখানে। তার এক তিলও বেশি নয়।

তবু সাগর শুধালো অতি কষ্টে, তবে ?

—টাকাটার কোন পাত্তাই যখন অন্য ভাবে হলো না তখন বাধ্য হয়ে সকলকেই খানাতল্লাসী করা হচ্ছে।

ঢোক গিলে সাগর প্রশ্ন করলো, আর সব ছেলেমেয়েদের স্যুটকেস-বাক্স দেখা হয়েছে ?

কে-একজন অধৈর্য কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে। শুধু ছেলেদের নয়, মেয়েদেরও।

—ওঃ। বলে সাগর চুপ করলো।

একটু পরে আবার প্রশ্ন করলো, বাবার ট্রাংক-স্যুটকেসও দেখা হয়েছে ?

প্রাণতোষবাবু বাড়ি ছিলেন না। স্কুলের কাজে সহরে গেছেন।

সাগরের এ-প্রশ্নে মনতোষবাবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, তাতে তোমার কাজ কি ? তোমার কাজ যা তাই করে ফেলো চটপট।

সাগর দৃপ্তকণ্ঠে বললো, না। বাবার স্যুটকেস খানাতল্লাসী না হওয়া পর্যন্ত আমার স্যুটকেস খোলা হবে না।

অকম্পিত অগ্নি-শিখার মতো সাগর বাড়ির ভিতর চলে গেলো।

পিছন হ'তে কে যেন বললো, ইস্—বাবা! কি আমার ছেলেরে! তবু যদি তিন কুলে কেউ থাকতো!

মনতোষবাবু আত্মসম্মানের জ্বালায় টং। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, দাদা নাই দিয়েই তো এই করেছে। আসুক দাদা ফিরে। হয় ওই সাধের পুত্তুরই থাকুক এ-বাড়িতে, নয় আমরা থাকি। এতো বড় স্পর্ধা, আমার মুখের উপর কথা বলে!

জল-খাবার না খেয়েই সাগর বেরিয়ে গেলো বাড়ি হতে।

মাঠের একপাশে শুয়ে পড়লো চিৎ হয়ে।

শীত পড়তে সুরু করেছে। শিশিরে ঘাসগুলো ভিজে গেছে। শুক্লা ষষ্ঠির বাঁকা চাঁদ উঠেছে আকাশে। তারি পানে চেয়ে সাগরের বুক হাহাকার করে কেঁদে উঠলো। কেউ নেই, ওর কেউ নেই।

কিন্তু ওর বাবা? প্রাণতোষবাবু? তাঁর স্নেহ? তাঁর ভালবাসা?

একটু রাত করেই সাগর বাড়ি ফিরে এলো। সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হলো কথার অগ্নি-বান।

মনতোষবাবু পাড়া মাথায় করে বলছেন, তখনই বলেছিলাম, কাজ নেই ওসব হা-ঘরে ছেলে বাড়িতে এনে। তা দাদা একেবারে পুত্র-স্নেহে গলে গেলেন। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত পর হয়ে গেলো। এখন ঠেলা সামলাও। মায় বাড়িটাকে চোরের আড্ডাখানা করে তোলো।

ব্যাপার বুঝতে বেশী দেরী হলো না। সাগরের অনুপস্থিতিতে তার সুটকেস খোলা হয়েছে এবং তার মধ্যে পাওয়া গেছে আড়াইটে টাকা। এ যে অপহৃত পাঁচ টাকারই ভগ্নাংশ, বাকি টাকা উড়েছে ফুর্তিতে, সে-বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। নইলে হা-ঘরে ছেলে আড়াই টাকার মুখ দেখবে কোত্থেকে। অতএব সাগর চোর।

নিঃশব্দে সাগর তার ছোট ঘরটিতে ঢুকলো।

ঘর কি সত্যি তার? না-না-না। সাগরের বিক্ষুব্ধ মন তীব্রকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। এ ঘর তার নয়। এ বাড়ি তার নয়। এখানকার কেউ তার নয়।

একবার সাগরের ইচ্ছা হলো, এই মুহূর্তে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে দূরে—বহু দূরে।

কিন্তু বাবা? প্রাণতোষবাবু? তাঁর অজ্ঞাতে চলে গেলে তিনিও যদি ওকে চোর মনে করেন?

অসহায় আবেগে সাগর বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

এ কী করলে ভগবান! শেষে চোর অপবাদ!

রাতেও সাগর কিছু খেলো না। দরজায় খিল লাগিয়ে অন্ধকার ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।

কেউ কেউ খেতে ডাকলো। কেউ বা করলো শাসন। নির্বিকার সাগর বিছানা ছেড়ে উঠলো না।

শেষ রাতের ট্রেনে প্রাণতোষবাবু ফিরে এলেন। অনাহারক্লান্ত সাগর তখন নিদ্রাচ্ছন্ন।

ছোট-ভাই ডালপালা লাগিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অবিলম্বে তাঁর কানে দিলেন। এবং জানিয়ে দিলেন যে, এ সব হা-ঘরে চোর-বদমাসের সঙ্গে তাঁরা ছেলে-পিলে নিয়ে থাকতে পারবেন না। এতে যা থাকে কপালে।

পশুপতিবাবুর মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো।

আহত পিতৃ-হৃদয় রক্তাক্ত হলো কঠিন আঘাতে।

এ কী করলে ভগবান? শেষে চোরের পিতৃত্ব!

দপ্‌ করে যেন আগুন জ্বলে উঠলো মাথায়।

সাগরের ঘরের সামনে এসে ডাকলেন, সাগর, দরজা খোলো।

ধড়মড়িয়ে উঠে সাগর দরজা খুলে দিলো। শুধালো ব্যগ্রকণ্ঠে, কখন এলেন আপনি?

—তোমার বিরুদ্ধে চুরির চার্জ, তুমি জানো? প্রাণতোষবাবুর কণ্ঠ বজ্রকঠিন।

স্বপ্ন ভেঙে গেলো। কঠিন মাটি।

সাগর ঠোঁট কামড়ে উত্তর দিলো, জানি।

—কি তুমি বলতে চাও এ সম্পর্কে?

কোন জবাব দিলো না সাগর। দৃঢ় কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করলো, আপনার কি মনে হয়?

প্রাণতোষবাবু জ্বলে উঠলেন, আমার কি মনে হয় না হয় সেকথা থাক। তোমার কি বক্তব্য তাই বলো। বলো, এ-সব সত্যি কি না?

এখানেও সন্দেহ?

পুত্র হতে যে প্রিয়তর, সামান্য পাঁচটা টাকার জন্যে তার উপরেও অবিশ্বাস?

তবে কি সবি মুখোস?

হ্যাঁ, তাই। নইলে তিনি তো দৃঢ় কণ্ঠে এ অভিযোগকে মিথ্যা বলেই উড়িয়ে দিতেন। তারপর অভিযোগমুক্ত পুত্রের মুখে শুনতে পারতেন প্রকৃত কাহিনী। তা তো তিনি করেন নি। বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসটাই তাঁর চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সবি মুখোস। সব শেষ।

বড় অভিমানে সাগর বিবেচনার সাগরের খেই হারিয়ে ফেললো।

পিতৃপম প্রাণতোষবাবুর অবিশ্বাসের সামনে দাঁড়িয়ে প্রকৃত কাহিনী বলে বিচারে খালাস পাবার রুচি তার হলো না।

অথচ তাহলে কতো সহজেই সব মিটে যেতো। কতো অনায়াসেই সাগর বলতে পারতো প্রকৃত কথা :

ক্লাস সেভে্ন্ থেকে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েই সাগর কয়েকখানি পুরানো অকেজো বই বিক্রি করে দিয়েছিলো অন্য একটি ছেলের কাছে। পেয়েছিলো গোটা আড়াই টাকা। কাউকে না জানিয়ে টাকাটা রেখে দিয়েছিলো নিজের রঙচটা টিনের স্যুটকেসে। পুজোর ছুটিতে হয় প্রতিমা-নিরঞ্জনের মেলা। সার্কাস আসে। বায়স্কোপ আসে। আসে কত রকমের জিনিসপত্র। সে-সময় আড়াইটে টাকা হাতে থাকলে কী মজাই না হবে। এই সব ভবিষ্যৎ আনন্দের স্বপ্নে বিভোর হয়েই সাগর টাকাটা রেখে দিয়েছিলো লুকিয়ে। কেউ জানে না। প্রাণতোষবাবুও না।

এই কথাটা বললেই বুঝি ঠিক হতো।

কিন্তু ব্যবহারিক জগতে যা ঠিক ভাবের জগতে তা অচল।

সাগর কিশোর, স্বপ্নময়, ভাব-বিলাসী। আসামী ও নয়।

তাই বড় অভিমানে ধীর সহজ গলায় প্রাণতোষবাবুর প্রশ্নের জবাবে বললো, হ্যাঁ, সব সত্যি।

সত্যি? প্রাণতোষবাবু বিস্মিত-বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলেন। আর কিছুই বলতে পারলেন না।

একটু পরে বললেন ঝাঁঝালো গলায়, আমারি ভুল হয়েছিলো। বিধাতার ইচ্ছায় আমি অপুত্রক। তাই আমি থাকব। তোমার সঙ্গে আর আমার পিতা-পুত্র সম্পর্ক থাকবে না। চোরের বাবা আমি নই, হতে পারি না।

আরো একটু পরে বললেন, তবে হ্যাঁ, তার জন্যে এ কথা মনে করো না যে, এখানে তোমার কোন অসুবিধা হবে। আমি যতদিন উপার্জনক্ষম থাকব, এ-বাড়ির দরজা তোমার সামনে কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

সাগর ভিজে গলায় বললো, আপনার অনুগ্রহই আমার পরম ভাগ্য।

প্রাণতোষবাবুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে সাগর প্রণাম করলো গভীর আবেগে। তারপর দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিলো।

কি যেন বলতে যেয়ে প্রাণতোষবাবু থেমে গেলেন।

চোখ মুছে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গেলেন।

রাত শেষ হয়-হয়। পশ্চিম আকাশে চাঁদ অস্ত-পথে। ধরণী রহস্যময়।

সন্তর্পনে বেরিয়ে এলো সাগর। প্রাণতোষবাবুর ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো।

দরজার পাশে ছিলো খড়মজোড়া। তারি পরে মাথা রেখে প্রণাম করলো। চোখের জলে ভিজলো খড়ম।

কাঠের বেড়ার ভিতর হতে নিঃশ্বাসের শব্দ কানে এলো। প্রাণ-তোষবাবু ঘুমোচ্ছেন। সাগর কান পাতলো। থেকে থেকেই খুব জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

সাগরের বুক কেঁপে উঠলো। শোবার অসুবিধা হলে ও-রকম শ্বাস-কষ্ট প্রাণতোষবাবুর হয়। এ অবস্থায় কতদিন সাগর তাঁকে আস্তে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়েছে।

আর আজ? সাগরের বুক ফেটে যেতে চায়। গলা আটকে আসে। চোখের জল বাঁধ মানে না।

খড়মজোড়াকে আর একবার প্রণাম করে ধীর পদে সাগর পথে নামলো।

নির্জন আকাশে শুকতারাটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

॥ ৬ ॥

সাগর চলে গেলো। সঙ্গে নিয়ে গিলো আমার অর্ধেক বুক। আমার দক্ষিণ চক্ষু। আমার অর্ধেক জীবন।

একটা মানুষকে হারিয়ে এত দুঃখ হয়, এর আগে তা বুঝি নি কোন দিন। সাগর নেই, সকল চিন্তার মধ্যে সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেই দুঃখটাই সেদিন অসহ্য হয়ে বার বার বুকখানাকে ভেঙে চৌচির করে ফেলছিলো।

সুদূর কৈশোরের সেই ব্যথা আজ আবার নতুন করে অনুভব করছি। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠছে অশ্রুর প্লাবনে। হাত কাঁপছে। চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে আসছে।

মনে পড়ছে, আরও একদিন এমনি করে সাগরকে পালাতে হয়েছিলো। পালাতে হয়েছিলো লাবণ্যর কাছ থেকে।

লাবণ্য।

সদাশিববাবুর কন্যা।

সাগরের জীবনের প্রথম নারী। যৌবনের প্রথম মানসী। প্রথম রামধনু জীবনের আকাশে। প্রথম ও শেষ।

সেদিন একটু রাত করেই বাড়ি ফিরেছিলো সাগর ও লাবণ্য।

শহর ছাড়িয়ে দূরে নদীর চরে বেড়াতে বেড়াতে কখন সন্ধ্যা নেমেছিলো ওরা টেরও পায় নি। তারপর আকাশে উঠেছিলো পূর্ণিমার ভরা চাঁদ। নদীর স্থির জলে আলোর আল্পনা। বাড়ির কথা, মাটির পৃথিবীর কথা ওরা বুঝি ভুলেই গিয়েছিলো।

সাগর আর লাবণ্য।

আজ আর ওরা টিউটর ও ছাত্রী নয়। যৌবনের প্রথম অনুরাগে রাঙা দুটি থরথর হৃদয়। সূর্যের দিকে পাপড়ি মেলে দেওয়া দুটি প্রাণ-পদ্ম।

গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই কানে এলো চড়া গলার আলোচনা। ভিতরের ঘরে কথা-কাটাকাটি চলেছে।

মিঃ ও মিসেস্ মুখার্জির মধ্যে প্রয়োজনের বাক্যালাপ অবশ্য হয়। কিন্তু নিভৃতে দুজনের বিশ্রাম্ভালাপ বা বিতর্ক এ-বাড়িতে প্রায় অঘটনের সামিল। ওরা দুজন তাই একটু বিস্মিত হয়েই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালো।

মিসেস্ মুখার্জি কড়া গলায় বললেন, ওদের এ ধরনের ছুট ছুট করে ঘুরে বেড়ানো আমি পছন্দ করি না। তোমার সাধের মেয়েকে আমি কিছু বললে তো আবার তোমার গায়ে ফোস্কা পড়বে। তুমিই ওকে সাবধান করে দিও, ও যেন সাগরের সঙ্গে এ ভাবে না মেশে।

নরম গলায় বললেন সদাশিববাবু, কিন্তু এতে দোষের কি আছে আমি তো বুঝতে পারছি না।

ঝাঁঝালো গলায় বললেন মিসেস্ মুখার্জি, বুঝতে তুমি কিছুই পারো না। দেখো, তোমার বয়স হয়েছে। মাথার চুল পেকেছে। অথচ এ কথাটা বুঝতে পারো না যে এ বয়সে ছেলেমেয়েদের এ ধরনের অবাধ মেলামেশার ফল ভাল হয় না। কেন? আমাদের জীবন দিয়েও কি বুঝতে পারো না যে এর পরিনাম শুভ নয়।

—ওঃ, বলে একটু চুপ করলেন মিঃ মুখার্জি। পরে শান্ত গলায় বললেন, আমাদের কথা ছেড়ে দাও। আমাদের দেখাশোনা একটা অ্যাকসিডেণ্ট মাত্র। তার ফলাফল ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সে বিচার আজ একেবারেই অনাবশ্যক। কিন্তু ওদের কথা যে আলাদা। ওরা আমাদের ছেলে-মেয়ের মত। দিনের পর দিন পাশাপাশি ওরা দিন কাটিয়েছে। তিলে তিলে ওদের মনে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মেছে। পরস্পরের প্রতি ওরা আকৃষ্ট হয়েছে, ভালবেসেছে।

আমি তো ভেবেই রেখেছি, পড়াশুনা শেষ করে সাগর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেই ওদের আমি বিয়ে দেব।

হঠাৎ যেন পায়ের কাছে উদ্যতফনা সাপ দেখে ভয়ার্তকণ্ঠে বললেন মিসেস্ মুখার্জি, বিয়ে! সাগরের বিয়ে! তুমি বুঝি তলে তলে এই সব মতলব পাকিয়ে বসে আছ? কই, এ কথা তো একদিনও আমাকে বলো নি?

—বলার সময় তো এখনো আসে নি। সময় হলে নিশ্চয় বলতাম। আজ হঠাৎ কথাটা উঠলো তাই বলে ফেললাম। কিন্তু ওদের বিয়ের কথা শুনে তুমি হঠাৎ আঁতকে উঠলে কেন? এ বিয়েতে কি তোমার মত নেই?

গম্ভীর গলায় মিসেস্ মুখার্জি উত্তর দিলেন, না।

—কিন্তু কেন? ছেলে হিসেবে ও তো লাবণ্যর অনুপযুক্ত নয়। তাছাড়া তুমিও তো ওকে খুব ভালবাস।

ধনুকের ছিন্ন ছিলার মত হঠাৎ যেন ছিটকে উঠলেন মিসেস্ মুখার্জি। অসংযত উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি ভালবাসি কি না সে কথা আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চাই না। যদি বেসেই থাকি তাতে তোমার মনে ঈর্ষা হচ্ছে কেন? তাতে অপরাধের কি আছে যে তাই নিয়ে তুমি আমাকে কথা শোনাতে এসেছ?

মিসেস্ মুখার্জির এই আকস্মিক উত্তেজনায় বড়ই অপ্রস্তুত বোধ করলেন সদাশিববাবু। অপরাধীর মত বললেন, কী মুস্কিল, আমার কথাটাকে তুমি এ ভাবে নিয়েছ কেন? সাগর আমাদের সকলেরই স্নেহের পাত্র। তুমি তাকে ভালবাসবে এতে আমার ঈর্ষা হবে কেন? এতটা ছোট তুমি আমাকে ভাবলে কেমন করে?

—না না, তুমি ছোট হতে যাবে কোন্ দুঃখে। ছোট আমি। আমি খারাপ। তাই আমার প্রতি তোমার ঘৃণার অন্ত নেই। আমার সব কাজের মধ্যেই তুমি দোষ খুঁজে বেড়াও। কেন? কেন? তোমার কাছে আমি কি এমন অপরাধ করেছি—

উচ্ছ্বসিত কান্নায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না মিসেস্ মুখার্জি। দ্রুত পায়ে ঘর থেকে চলে গেলেন।

সদাশিববাবু হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

বিস্ময়ে ও বেদনায় বিমূঢ় দৃষ্টি তুলে সাগর ও লাবণ্য পরস্পরের দিকে তাকালো।

জীবনের রামধনু রঙের উপর লেগেছে প্রথম কালি-প্রলেপ। সে কালিতে কি ছেয়ে যাবে সারা আকাশ? মুছে যাবে সব রঙ? সব আলো?

সেদিন রাতে বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে অনেক কথাই ভাবলো সাগর।

অনেক প্রশ্নই ওর মনকে আলোড়িত করলো।

ওদের বিয়েতে মিসেস্ মুখার্জি এমন দৃঢ় আপত্তি জানালেন কেন? ওকে তো তিনি খুবই স্নেহ করেন। অপুত্রক এই দম্পতি বুঝি বা তাকে পুত্রাধিক ভালবাসেন।

চকিতেই একটা দিনের কথা ওর মনে পড়ে গেলো।

সাগরের জন্মদিন।

তিন শো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে ওই একটি দিনের যে বিশেষ একটি গুরুত্ব আছে, নানা অবহেলায় ও উপেক্ষায় সাগর সে কথা ভুলেই গিয়েছিলো।

স্মরণ করিয়ে দিলেন মিসেস্ মুখার্জি। কথায় কথায় একদিন ওর জন্মদিনের তারিখটা জানতে পেরে সোল্লাসে বলে উঠলেন তিনি, ঠিক আছে সাগর। এবার ঐ তারিখে তোমার জন্মদিনে আমরা উৎসব করব।

মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলো সাগর। একটু বা লজ্জিতও বোধ করেছিলো।

কিন্তু কোন আপত্তি মানেন নি মিসেস্ মুখার্জি। স্বয়ং অগ্রণী হয়ে উৎসবের আয়োজন করেছিলেন।

সাধারণ ঘরোয়া উৎসব। নিমন্ত্রিত অতিথি কেউ ছিলো না। সাগরই সে উৎসবের প্রধান ও একমাত্র অতিথি।

তিনিই তাড়া দিয়ে সাগরকে স্নান করিয়েছিলেন সাবান মেখে। নিজে হাতে উপহার দিয়েছিলেন কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি। আসনে বসিয়ে কপালে এঁকে দিয়েছিলেন চন্দনের ফোঁটা।

আবেগে উচ্ছ্বসিত অন্তরে সাগর সে উপহার গ্রহণ করেছিলো। মাথা নিচু করে নিয়েছিলো চন্দনের অলংকরণ।

স্মরণ কালের মধ্যে ওকে কেন্দ্র করে এই প্রথম উৎসবের আয়োজন। দুঃসহ সুখের একটা অব্যক্ত ক্রন্দন যেন বার বার ঠেলে উঠতে চেয়েছিলো বুকের ভিতর থেকে। অনেক কষ্টে সে ক্রন্দনকে সাগর চেপে রেখেছিলো অনেকক্ষণ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি।

আশীর্বাদের শেষে মিসেস্ মুখার্জি নিয়ে এলেন পঞ্চ ব্যাঞ্জণে সাজানো খাবারের থালা।

থালার সামনে বসে সাগর যেন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লো। এত সুখ, এত আনন্দ—এতদিন কোথায় ছিলো ওর জীবনে!

মিসেস্ মুখার্জির সস্নেহ অনুরোধে খাবারের থালায় হাত দিলো সাগর। কোনক্রমে কয়েক গ্রাস মুখে তুললো। কিন্তু সেই দুর্বার কান্নাটা যেন বার বার তার কণ্ঠনালিকে চেপে ধরছে। কিছুতেই সে কিছু খেতে পারছে না।

তারপরই ঘটলো সেই আশ্চর্য মধুর অভিজ্ঞতা।

মিসেস্ মুখার্জি নিজের হাতে মাছের ঝোল-ভাত মাখিয়ে গ্রাসের পর গ্রাস তুলে দিতে লাগলেন ওর মুখে।

আর যন্ত্র চালিতের মতো সাগর তা খেতে লাগলো একের পর এক।

ওর দুই চোখ বেয়ে ঝরতে লাগলো আনন্দের অশ্রুধারা।

তাই তো বিছানায় শুয়ে সাগর ভাবতে লাগলো, সেই স্নেহ, সেই

ভালবাসা, সেতো এক দিনের আকস্মিক প্রকাশ নয়। দিনের পর দিন মিসেস্ মুখার্জির স্নেহ-ভালবাসা, সেবা-যত্নের অমৃত নির্ঝরে সে তো স্নান করেছে। পবিত্র হয়েছে। ধন্য হয়েছে।

তাহলে আজ কেন তাদের বিয়ের প্রস্তাবে তাঁর এতো প্রবল আপত্তি ?

সন্তানস্নেহে যাকে গ্রহণ করেছে অযাচিত করুণায়, জামাতারূপে তাকে গ্রহণ করতে কেন এই দৃঢ় অস্বীকৃতি ?

কেনই বা তার প্রতি ভালবাসার ইঙ্গিতে এমন তীব্র বিস্ফোরণে তিনি ফেটে পড়লেন ?

কেন তাঁর মনে এই অকারণ অপরাধ-বোধ ?

সে-রাতে এমন অনেক প্রশ্নই সাগরের বেদনার্ত মনকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিলো, যার কোন জবাবই সেদিন সে খুঁজে পায় নি।

কিন্তু সেই জবাব যেদিন আর একটি আকস্মিক ঘটনার ভিতর দিয়ে তার চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়লো, সেদিন ক্ষোভে ও দুঃখে, বেদনায় ও ঘৃণায় সাগর যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেলো।

মুহূর্তে সেদিন কালো হয়ে গেলো জীবনের রঙ। কোন্ পিশাচিনীর নির্মম হাত কালি লেপে দিলো সারা আকাশ জুড়ে। স্বপ্ন গেলো, সাধ গেলো, নিভে গেলো সব আলো আর সব আশা। দুরপনেয় সীমাহীন নৈরাশ্যের অন্ধকার গ্রাস করলো বুঝি ওর অনাগত সমস্ত জীবন।

॥ ৭ ॥

পরদিন একটু দেরি করেই ঘুম ভাঙলো সাগরের।

সারা গায়ে কেমন একটা ব্যথা। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। মাথাটা ভয়ানক ভারী। চোখ দুটোও জ্বালা করছে।

পাশ ফিরে উঠতে যেয়েও কেমন যেন বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা করলো না। যেমন শুয়ে ছিলো তেমনি চিৎ হয়ে পড়ে আবার চোখ বুঁজলো।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো লাবণ্য। বললো, এ কি? তুমি এখনো শুয়ে আছ? শিগ্‌গির উঠে মুখ ধুয়ে এসো। তোমার চা এনেছি।

চোখ খুলে তেমনি শুয়ে থেকেই সাগর বললো, ভাল লাগছে না বন্যা (রবিঠাকুরের অনুকরণে সাগর ইদানীং লাবণ্যকে বন্যা বলে ডাকতে শুরু করেছে), বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না।

—সে কি? অসুখ-বিসুখ করে নি তো?

সাগরের কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠলো লাবণ্য, এ কি! তোমার যে জ্বর এসেছে। কাল এতো করে বারণ করলাম, সন্ধ্যে বেলা জলে পা ভিজিও না, তা শুনলে কি আমার কথা।

—সত্যি, তোমার কথাটা না শোনা অন্যায়ই হয়েছে। সে জন্যে মাফ কিজিয়ে।

কৃত্রিম রোষের সঙ্গে লাবণ্য বললো, থাক হয়েছে। এখন চুপ করে শুয়েই থাক। আমি ততক্ষণে তোমার হাত-মুখ ধোবার জল আর থার্মোমিটারটা নিয়ে আসছি।

ঘরে ঢুকলেন মিসেস্ মুখার্জি। রূঢ়কণ্ঠে বললেন, থাক, তোমাকে আর এদিক সামলাতে হবে না। পড়াশুনা তো শিকেয় তুলে দিয়েছ।

দিনরাত শুধু আড্ডা আর গল্প। এ সব ছেড়ে একটু বরং পড়াশুনায় মন দাও গে। এদিকে যা করবার আমি করছি।

মায়ের কণ্ঠস্বরে আহত হলো লাবণ্য। কাল রাতের কথাগুলো তখনো ওরা ভোলে নি। সাগরও সবিস্ময়ে চোখ মেলে তাকালো। স্নেহময়ীর কণ্ঠে এ কী অকারণ তিক্ততা!

ধীর পায়ে পাশ কাটিয়ে লাবণ্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মিসেস্ মুখার্জি এগিয়ে যেয়ে সাগরের কপালে ও মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সাদর কণ্ঠে বললেন, কেন যে রাত-বিরেতে যেখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করে বেড়াও তাতো বুঝি না। আর মেয়েটাও হয়েছে তেমনি। বাপের লাই পেয়ে পেয়ে একেবারে মাথায় উঠে বসেছে।

সাগর চোখ বুঁজেই চুপ করে রইলো। কোন কথা বললো না।

—তোমার মুখ ধোবার জল ও থার্মোমিটার নিয়ে আমি এখুনি আসছি। তুমি চুপ করে শুয়ে থাক।

সাগর এবারও কোন কথা বললো না। মনটা ওর তিক্ততায় ভরে উঠেছে।

মিসেস্ মুখার্জি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থেকে ঘর থেকে চলে গেলেন।

এক দিন দুদিন করে সাত দিন হয়ে গেলো। সাগর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলো না।

অসুখ ক্রমেই বাড়তির পথে। জ্বর ছাড়ে না। তার উপর পেটের অবস্থাও ভাল নয়।

ডাক্তার গম্ভীর গলায় বললেন, রোগটা টাইফয়েড টার্ণ নেবে বলে মনে হচ্ছে।

সদাশিববাবুর পিছনে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে ছিলো লাবণ্য। ডাক্তারের মন্তব্য শুনে তার মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেলো।

ডাক্তার প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দিয়ে চলে গেলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বললো, কি হবে বাবা?

সদাশিববাবু সান্ত্বনার স্বরে বললেন, কি আবার হবে? অসুখ করেছে, ভালভাবে চিকিৎসা হলেই সেরে যাবে। এতে ভয় পাবার কি আছে? তোরা দুজন তো রয়েছিস, ভাল করে সেবা-শুশ্রূষা কর। ও ভাল হয়ে যাবে।

ঘরে ঢুকলেন মিসেস্ মুখার্জি। কঠিন কণ্ঠে বললেন, এমনিতেই তো মেয়ে পড়াশুনার কাছেও ঘেসে না, তার উপর ওই মন্তর তুমি ওর কানে দিয়ে দাও, তাহলেই একেবারে সোনায় সোহাগা হবে।

—কিন্তু রুগীর সেবার ব্যবস্থা তো করতেই হবে, নীচু গলায় বললেন সদাশিববাবু।

—সে কি করতে হবে না হবে আমি বুঝব। তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। মেলা বাজে না বকে তোমরা এখন যাও তো এ-ঘর থেকে। সাগরের বিছানাটা এবার ঠিক করে দিতে হবে।

একটু চুপ করে থেকে সদাশিববাবু বললেন, একটা রুগীর সেবা-যত্নের অনেক ঝামেলা। তুমি একা—

তীব্র কণ্ঠে বাধা দিলেন মিসেস্ মুখার্জি, দশটা নার্স রাখবার মত পয়সা যখন তোমার নেই তখন আমার জন্য এ দরদটুকু না দেখালেও চলবে। আসলে তোমার ব্যথাটা যে কোথায় তা কি আমি জানি নে।

সবিস্ময়ে সদাশিববাবু বললেন, কী বলছ তুমি?

—ঠিকই বলছি। আর এও তোমাকে বলে দিচ্ছি, সেবার অছিলা করে তোমার মেয়ে যে দিনরাত ছেলেটার কাছে ঘুর ঘুর করবে এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।

আর্তকণ্ঠে লাবণ্য ডাকলো, বাবা!

অত্যন্ত কষ্টে নিজেকে সংযত করে সদাশিববাবু বললেন, আয় মা, আমরা এ ঘর থেকে চলে যাই। সাগরের ভার তোমার মা একাই নিতে পারবেন। আমাদের কারো সাহায্যের দরকার হবে না।

মেয়ের হাত ধরে ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সদাশিব-বাবু।

সেই সময়ে তিনি যদি একটিবার ফিরে তাকাতেন তাহলে দেখতে পেতেন কী এক অসহায় যন্ত্রণা ও গভীর আকুতি ফুটে উঠছে রোগ-ক্লান্ত সাগরের দুটি চোখের তারায়।

শুধু এই একটি মাত্র ঘটনাই নয়, কিছুদিন থেকে বাবা ও মেয়ে দুজনই গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন, মিসেস্ মুখার্জি যেন একটা অহেতুক উৎকণ্ঠার সঙ্গে সাগরকে সর্বক্ষণ ঘিরে রেখেছেন তাদের নাগালের বাইরে।

প্রাণপাত করে তিনি সাগরের সেবাশুশ্রূষা করছেন। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন সে জন্যে। অথচ কিছুতেই স্বামী-কন্যাকে সে পরিশ্রমের অংশ গ্রহণ করতে দিচ্ছেন না।

এ জন্য লাবণ্যর মনে বেদনার অন্ত নেই। মায়ের সতর্ক প্রহরার প্রাচীরে বৃথাই সে মাথা ঠুকে মরছে। তাকে অতিক্রম করে কোন মতেই সাগরের কাছে পৌঁছুতে পারছে না।

সদাশিববাবু নীরবে সব লক্ষ্য করেন। মেয়ের দুঃখে দুঃখ বোধ করেন। স্ত্রীর ব্যবহারে বিস্ময়ের তাঁর অন্ত নেই। কিন্তু এ নিয়ে কোন কথা বলেন না। তিনি ভালভাবেই জানেন, তাতে হিতে বিপরীতই হবে। কোন লাভ হবে না।

রোগ শয্যায় শুয়ে সাগরের দুটি তৃষ্ণাতুর চোখ বৃথাই তার মানসীকে খোঁজে। কখনো অভিমানের কান্না দুটি চোখে উপচে পড়ে। মিসেস্ মুখার্জি সাদরে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেন, ভয় কি সাগর, শিগগিরই তুমি ভাল হয়ে যাবে।

সাগর চোখ বুঁজে চুপ করে থাকে। কোন কথা বলে না।

এমনি করে দিন কাটে।

ধীরে ধীরে সাগর ভাল হয়ে ওঠে।

মিসেস্ মুখার্জির চোখমুখ হাসিতে খুশিতে ঝল্‌মল্ করে। জয়ের আনন্দ যেন নাচতে থাকে তার চোখের তারায়।

সাগর যত দেখে ততই অভিভূত হয়। অসুখের সময় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে তিনি ওর সেবা করেছেন। অসুখ নিরাময়ের পর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন তৃপ্তিতে ও আনন্দে।

কী ভাগ্য সাগরের যে এমন একটি মহিমময়ী মমতাময়ী নারীর স্নেহ সে লাভ করেছে। জীবন বিধাতার এ কী অসীম করুণা তার মত এক ভাগ্যহীনের উপর!

গভীর আশ্বাসে চোখ বোঁজে সাগর।

মিসেস্ মুখার্জি তখনো তার চুলগুলি নিয়ে খেলা করতে করতে ডাকেন বার বার, সাগর—সাগর—

॥ ৮ ॥

রোগ থেকে সেরে উঠবার পরেও আরো একদিন তেমনি মধুর কণ্ঠের ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো সাগর।

গভীর হতে গভীরতর হয়েছিলো রাত।

সমস্ত বাড়িটাকে ঘিরে নেমে এসেছিলো নিশুতি রাতের স্তব্ধতা।

ঘরের দেওয়াল ঘড়িটা শুধু অবিরাম বাজছিলো টিক্ টিক্ টিক্।

অবিরাম বয়ে চলেছিলো সময়ের নদী।

দুর্বার তার বেগ।

অমনি দুর্বার বুঝি মানুষেরও মন।

কেউ তার গতিরোধ করতে পারে না।

না সমাজ না সংস্কার। না শিক্ষা না সংস্কৃতি।

মনের দুর্নিবার বেগ আপন আবেগে সব কিছুকে ভাসিয়ে সব বাধা-বিঘ্নকে ভেঙে এগিয়ে চলে আপন পথে।

টিক্ টিক্ টিক্।

আপন খেয়ালে চলতে চলতে এক সময়ে ঘড়িটা টং টং করে বেজে উঠলো।

শরীরের উপরে একটা আতপ্ত চাপ অনুভব করে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো সাগরের।

ঘর অন্ধকার। চোখ খুলেও কিছুই দেখতে পেলো না।

শুধু অনুভব করলো গভীর আতংকে, কার যেন একটা তীব্র তীক্ষ্ণ নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে তার চোখে-মুখে।

কে যেন বিষাক্ত ময়াল সাপের মত পাকে পাকে তাকে জড়িয়ে ধরছে।

ভীত কণ্ঠে সাগর বললো, কে? কে?

তৎক্ষণাৎ একটা হাত দিয়ে ওর মুখটা চেপে ধরে সাপের হিস্ হিস্ শব্দের মত চাপা গলায় কে যেন বললো, চুপ সাগর, চুপ। আমি।

মিসেস্ মুখার্জি।

মমতাময়ী মাতৃমূর্তি।

গভীর রাতের অন্ধকারে এ কী ভয়ংকরী মোহিনী মূর্তিতে ঘটেছে তার আত্মপ্রকাশ।

এত স্নেহ এত ভালবাসার অন্তরালে লুকিয়ে ছিলো জঘন্য পংকিলতার এ কী ক্লেদাক্ত ধারা।

ছিন্নকণ্ঠ ছাগশিশুর মত চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠলো সাগর, আপনি। কী চান আপনি?

লোভাতুর গলায় উত্তর এলো, আমি তোমাকে চাই সাগর, তোমাকে চাই।

—না না, তা হয় না। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনার ছেলের মত।

—না না, তোমাকে আমার চাই। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না।

বলতে বলতে লালসাতপ্ত ছুটি কম্পিত ঠোঁট তিনি চেপে ধরলেন সাগরের ভীত সংকুচিত ঠোঁটের উপর।

তীব্র কামার্তিতে লেহন করতে লাগলেন সাগরের সারা মুখ।

ছুই লালসাকঠিন হাতে চেপে ধরলেন সাগরের যৌবনদীপ্ত দেহ।

মুহূর্তের জন্য যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলো সাগর। অভিভূতের মত নিজেকে অসহায় ভাবে সমর্পণ করে দিলো কামময়ীর নিষ্ঠুর কবলে।

পরক্ষণেই জাগ্রত হলো তার অপাপবিদ্ধ পৌরুষ।

হরিণ-পবিত্রতার প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে মোহময়ীর কবল থেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়ালো শয্যা ছেড়ে।

উন্মাদের মত ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন মিসেস্ মুখার্জি। কাতর কণ্ঠে বললেন, না না সাগর, তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না। আমার কথা শোন লক্ষ্মীটি, আমার যা কিছু আছে সব তোমাকে দেব, টাকাকড়ি, গয়নাপত্র—

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কী বলছেন? এ যে আমার স্বপ্নেরও অগোচর। দোহাই আপনার, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। এ ঘর থেকে এখুনি চলে যান—

দৃঢ় বলে নিজেকে ছাড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সাগর।

বাধা দিতে ছুটে এলেন মিসেস্ মুখার্জি।

ততক্ষণে সাগর ঘরের দরজা খুলে ফেলেছে এক টানে।

দরজা খুলেই আতংকে একটা অস্পষ্ট শব্দ করে দুই পা পিছিয়ে গেলো সাগর।

দরজার সামনে আবছা আলো-আঁধারিতে চোখে পড়তেই ভূত দেখার মত আঁতকে উঠলেন মিসেস্ মুখার্জিও।

ঘরের দরজায় নিশ্চুপ পাষাণমূর্তির মত দাড়িয়ে আছেন সদাশিববাবু।

অনুভূতিহীন নিষ্পলক চোখ। অবাতনিষ্কম্প মূর্তি।

কতক্ষণ তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন কে জান।

মিসেস্ মুখার্জির মনে হলো, বুঝি বা সারা জীবন তিনি অমনি নিশ্চল পাষাণ-মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন তার গৃহ-দ্বারে।

পরমুহূর্তেই সম্বিত ফিরে এলো তাঁর মনে। ভ্রূকুটিকুটিল কঠিন দৃষ্টিতে সদাশিববাবুর দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন।

ঠোঁটের উপরে তর্জনী তুলে তাঁকে বাধা দিলেন সদাশিববাবু।

তারপর ধীর নিরুত্তাপ নিচু গলায় বললেন, আমার সঙ্গে এসো। কথা আছে।

কী মন্ত্রে কে জানে মিসেস্ মুখার্জির উদ্ধত দৃষ্টি সহজেই অবনত হলো। কোন কথাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরলো না আর।

নিজের বেশবাস সম্বৃত করে তিনি ধীর কুণ্ঠিত পায়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

একটা দুর্বোধ্য আতংকে হাঁ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছিলো সাগর।

ঘটনার আকস্মিকতা ও তীব্রতার প্রচণ্ড আঘাতে ওর বিচার-বিবেচনা সব যেন ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিলো।

উদ্যত খড়্গের নিচে অসহায় ছাগশিশুর মত ভীত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থর্ থর্ করে কাঁপা ছাড়া আর যেন কিছুই ভাববার বা করবার শক্তিও তার ছিলো না।

এবার সদাশিববাবুকে গমনোন্মুখ দেখে সহসা যেন তার কর্তব্য-বোধ জাগরিত হলো।

আত্মদোষস্খালনের জন্য কী যেন বলতে যেয়েও কিছুই ও বলতে পারলো না। একটা দুর্বার অপরাধ-বোধ যেন ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে একেবারে অবশ করে দিলো।

শুধু বার দুই আমি—আমি—এই শব্দটি আর্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেই স্তব্ধ হয়ে গেলো ওর রসনা।

শায়কবিদ্ধ পশুর মত অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো সাগর।

সকরুণ দৃষ্টিতে একটিবার মাত্র সে দিকে তাকিয়ে সদাশিববাবু দরজার কাছ থেকে চলে গেলেন।

যাবার আগে ইঙ্গিতে আর একবার ডাকলেন মিসেস্ মুখার্জিকে।

তিনিও পাশবদ্ধ শিকারের মত স্বামীকে অনুসরণ করলেন বিনা দ্বিধায়।

ঘরে ঢুকেই দরজায় খিল এঁটে দিলেন সদাশিববাবু।

বাইরের দিকের জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। একাগ্র চিন্তায় মুদ্রিত হলো দুটি চোখ। ধীরে ধীরে দৃঢ় সংকল্পে সন্নিবদ্ধ হলো দুটি চাপা ওষ্ঠ।

মুখ ফিরিয়ে ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, দেখো, মানুষের ভিতরই পশু বাস করে। তাই পশুর কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা মানুষের ভিতরই আছে। থাকবেও। কিন্তু তাই বলে মানুষ তো পশু নয়। শিক্ষা দিয়ে, দীক্ষা দিয়ে, সভ্যতা দিয়ে, সংস্কৃতি দিয়ে সেই পাশব বৃত্তির উপর মানুষ সংযমের আবরণ চাপিয়ে দেয়। সেইটেই তার মনুষ্যত্বের প্রকাশ। কিন্তু তুমি এ কী করলে? সেই পশুত্বের কাছেই শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করলে?

মিসেস্ মুখার্জি কোন জবাব দিলেন না। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আবার কথা বললেন সদাশিববাবু, হয়তো তোমার আজকের আচরণের জন্য তুমি একাই দায়ী নও। আমিও এর জন্য দায়ী। আমার ভালবাসা দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে আমি হয়তো তোমার মনকে পূর্ণ করে তুলতে পারি নি। তোমার মনের হাহাকারকে মেটাতে পারি নি। কিন্তু সেতো আমার অক্ষমতা। তার জন্য তুমি আমাকে শাস্তি দিলেই তো পারতে। যে কোন শাস্তি। আমি হয় তো হাসি মুখে সে শাস্তি সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু আমার অপরাধের শাস্তি তুমি ওদের ঘাড়ে চাপালে কেন? ওরা আমাদের সন্তান। ওদের ফুলের মতো জীবনের উপর এ বিষ তুমি ছাড়ালে কেন? তোমাকে-আমাকে কেন এমন নীচ করে তুললে ওদের কাছে?

এ-ভৎর্সনারও কোন জবাব দিলেন না মিসেস্ মুখার্জি। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি মুখ নিচু করে নীরবেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

সদাশিববাবু মুখ খুললেন। সংকল্পে দৃঢ় তাঁর কণ্ঠস্বর।

—সে যা হবার তা হয়ে গেছে। তা নিয়ে শোচনা এখন বৃথা। এবার কাজের কথা শোন। তোমার উপর আর আমি বিশ্বাস রাখতে পারছি না। উদগ্র লালসার রাশ একবার যখন তুমি ছেড়ে দিয়েছ তখন আর তাকে বিশ্বাস নেই। অথচ সাগর ও লাবণ্যর জীবনকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ আমাকে দিতেই হবে। তাই আমি স্থির

করেছি, দু-চার দিনের মধ্যে যে শুভদিন পাব সেই লগ্নে ওদের বিয়ে দিয়ে দেব। তারপর এ বাড়ি থেকে ওদের পাঠিয়ে দেব দূরে কোথাও।

হঠাৎ যেন জ্যামুক্ত শরের মত সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মিসেস্ মুখার্জি। তীব্র কণ্ঠে বললেন, না না, সে তুমি করতে পারবে না। এ বিয়ে আমি হতে দেব না। কিছুতেই না!

—কিন্তু এ বিয়ে আমি দেবই। তোমার কোন কথা শুনব না।

—তা শুনবে কেন? আজ যে আমার রূপ নেই, যৌবন নেই, আজ আর আমার কথা তুমি শুনবে কেন? অথচ একদিন ছিলো যেদিন আমার একটি কথা শুনবার জন্য তুমি কুকুরের মত আমার পা চাটতেও রাজী ছিলে।

—কী যা তা বকছ? চুপ করো।

—না, চুপ করব না। তোমার সাধুত্বের মুখোশ আমি খুলে দেব। তুমি সাধু, আর আমি দুশ্চরিত্রা, না? তুমিই একটু আগে বললে না, লালসার রাশ আমি ছেড়ে দিয়েছি? কে আমাকে মন্ত্রণা দিয়েছিলো সে রাশ ছেড়ে দিতে? আজ বুঝি সব ভুলে গিয়েছ? সব ভুলে আজ সাধু হয়ে বসেছ! সাধু! একটি সরলা গ্রামের মেয়েকে ভুলিয়ে এনে তার সর্বস্ব অপহরণ করে অবহেলায় অনাদরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। কত দিন কত রাত তোমার পায়ে মাথা কুটেছি। বড় বড় কথার ঝড় তুলে আমাকে তুমি দূরেই সরিয়ে রেখেছ। মনে মনে আমাকে ঘৃণা করেছ—কুলত্যাগিনী বলে, ভ্রষ্টা বলে। আর বাইরে উদার ক্ষমার মুখোশ মুখে টেনে নিজের মেয়ের মায়ের আসনে আমাকে বসিয়েছ সমাজের সামনে।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো সদাশিববাবুর। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, তুমি চুপ করবে কি না?

—না। কেন চুপ করব? দুদিনের সখ মিটিয়েই আমার ক্ষুধার্ত যৌবনকে তুমি অবহেলা করেছ অশ্লীল বলে, অশুচি বলে।

তার ফলে আজ যদি সে ক্ষুধা বাঁকা পথ ধরেই থাকে তাকে তুমি বাধা দেবে কোন্ অধিকারে ?

—এত রাতে তোমার সঙ্গে অধিকারের আলোচনা করতে আমি চাই না। আমার সংকল্পের কথাটাই শুধু তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। স্থির জেনো, কোন বাধাই আমাকে সে সংকল্প থেকে নড়াতে পারবে না। তোমার কাছে শুধু এই অনুরোধ, এই শুভ মুহূর্তে তোমার ভিতরের ওই কুৎসিৎ মূর্তিটাকে তুমি আর প্রকাশিত করো না।

হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রুগীর মত সহসা চীৎকার করে উঠলেন মিসেস্ মুখার্জি, তার আগেই তোমার আসল চেহারাটাও আমি ওদের চোখের সামনে খুলে ধরব। দেখব তখন কোথায় থাকে তোমার পিতৃত্বের গৌরব আর সাধুগিরির অহংকার।

মিসেস্ মুখার্জির সেই ভয়ংকর অর্ধোন্মাদ চেহারা দেখে প্রমাদ গুনলেন সদাশিববাবু।

উদ্যত ফনা তুলেছে বিষাক্ত বিষহরি।

ছোবলে তার তীব্র হলাহল।

নিজের জীবনে সে হলাহল আকণ্ঠ পান করে তিনি আজ নীলকণ্ঠ।

কিন্তু সে বিষের তীব্র জ্বালা তো সইতে পারবে না তাঁর বড় আদরের লাবণ্য ও সাগর। বিষের জ্বালায় যে জ্বলে পুড়ে নীল হয়ে যাবে তাদের প্রাণ-কুসুম।

সে-জ্বালার হাত থেকে তাদের তো বাঁচাতেই হবে।

মরিয়া হয়ে গেলেন সদাশিববাবু।

দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন দরজা। বললেন, সে সুযোগ তোমাকে আমি দেব না। তাই বলে ফাঁকিও আমি কাউকে দেব না। নিজেই সব কথা ওদের কাছে খুলে বলব। তারপরও যদি পরস্পরকে গ্রহণ করতে ওরা রাজী থাকে, কালই আমার সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থকে পাথেয় হিসাবে দিয়ে ওদের পাঠিয়ে দেব অনেক দূরে তোমার নাগালের বাইরে।

বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে একটা আর্ত চীৎকার ভেসে এলো, না—না—না—

তারপরই একটা ভারী জিনিস পতনের শব্দ কানে এলো।

মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করলেন সদাশিববাবু।

পরক্ষণেই দ্রুত পা ফেলে ছুটে গেলেন সাগরের ঘরে।

ঘর জনশূন্য। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে বিছানার উপরে।

সাগর নেই।

শংকিত কণ্ঠে ডাকলেন, সাগর—

কোন জবাব এলো না।

ঘরে ঢুকলেন।

বিছানার উপর এক টুকরো কাগজ। সাগরের নিজের হাতে লেখা।

কম্পিত হাতে কাগজখানা তুলে নিলেন সদাশিববাবু। পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে দিলেন।

শ্রীচরণেষু, আমাকে ক্ষমা করবেন। এ-মুখ আর আপনাকে দেখাতে পারব না। লাবণ্যকেও না।

ভগবান যদি থাকেন, দোষ-অপরাধের বিচার তিনিই করবেন। আপনি শুধু এইটুকু বিশ্বাস করুন, আপনি আজ যা দেখেছেন তার সবটুকুই সত্য নয়। আমি অপরাধী নই।

আপনার কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। তবু আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করে সে ঋণের বোঝা আরো বাড়িয়ে চিরদিনের মত আমি এ বাড়ি থেকে চলে গেলাম।

লাবণ্যকে বলবেন, তাকেও আমি মুক্তি দিয়ে গেলাম। পারে তো এই ভাগ্যহীনকে সে যেন ক্ষমা করে—ভুলে যায়।—সাগর

কাগজের টুকরোটা সমেত দুই হাতে চোখ ঢাকলেন সদাশিববাবু। তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে লাবণ্য।

॥ ৯ ॥

সাগরের সাথে আমার জীবনের যেন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে। নইলে পথের বাঁকে বাঁকে বারে বারেই ওর সাথে আমার দেখা হয় কেন?

বিরাট পৃথিবীর নানা পদচিহ্নের চাপে সাগরের পায়ের দাগও ঢেকে গিয়েছিলো।

বুঝি বা মুছেও গিয়েছিলো আমার মন থেকে।

তবু আবার সে ফিরে এলো।

তখন সবে সংবাদপত্রের আপিসে চাকরিতে ঢুকেছি। থাকি বৌবাজার অঞ্চলের একটা মেসে।

দিনের কাজ সেরে মেসে ফিরতেই রুম-মেট সুধীরবাবু বললেন, আচ্ছা মশায়, আপনি পাগলাকে চেনেন?

অপরিচিত নাম। বললাম, কে পাগলা? কই চিনি না তো?

সুধীরবাবু হেসে বললেন, আপনার ক্লাস-ফ্রেণ্ড সাগর সেনকে চেনেন না?

বিস্মিত হলাম, সাগর! আপনি চেনেন নাকি তাকে?

ও-পাশ হ'তে অক্ষয়বাবু বললেন, চিনি মানে? সেই তো আমাদের পাগলা। অনেক দিন সে তো আমাদের রুমেই থাকতো। আমরা তখন ছকু খানসামা লেনের একটা ঘরে থাকতাম। নিজেরাই রান্না করে খেতাম।

বললাম, আশ্চর্য।

সুধীরবাবু বললেন, তার চেয়ে অধিক আশ্চর্য, আর খানিক পরেই বন্ধুর দেখা পাবেন।

—এখানে?

—হ্যাঁ মশায়, হ্যাঁ। আজি বিকেলে ধুমকেতু অকস্মাৎ এসে হাজির। আপনার টেবিল থেকে এ মাসের ভারতবর্ষ খানা খুলে পড়তে পড়তে আপনার কবিতাটি পড়েই বললো, এ কবিকে আমি চিনি। আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড। তারপর কথায় কথায় সব জানলাম। আপনার খুব প্রশংসা করলো।

সাগরের প্রশংসা! চিতা-ভস্মের মুখে জীবনের বন্দনা!

কোন জবাব দিলাম না।

সন্ধ্যার পরেই সাগর এলো।

সাগর নয়, পাগলা। উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের দগ্ধাবশেষ ভস্মরাশি মাত্র।

খাঁকির একটা ময়লা হাফ-সার্ট গায়। পায়ে গোড়ালিহীন ছেঁড়া স্যাণ্ডেল। চুল উস্কোখুস্কো। চেহারা রুগ্ন। মুখে, ঘাড়ে ও হাতের স্থানে স্থানে অযত্নসঞ্চিত ধুলোমাটির কালো কালো দাগ।

জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত অসহায় সৈনিক যেন।

আমাকে দেখেই একটা হাসি খেলে গেলো সাগরের মুখে।

জোর করে টেনে আনা হাসি। মেঘে-ঢাকা আকাশে তৃতীয়ার ম্লান চাঁদের মতো।

হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললাম, সাগর কলকাতায় এসেছিস্ কতো দিন?

নির্বিকার কণ্ঠে সাগর জবাব দিলো, সে অনেক দিন।

—বারে, তবে এতদিন খোঁজ-খবর করিস্ নি কেন?

সাগরের মুখ আরো কালো হয়ে উঠলো। কি যেন ভাবলো। তারপর বললো গম্ভীর হয়ে, কি জানো, কলকাতায় তুমি যে এম. এ. পড়তে সে আমি জানতাম। অনেক দিন মনেও হয়েছে য়ুনিভার্সিটিতে যেয়ে তোমার সাথে দেখা করি।

সাগর চুপ করলো।

প্রশ্ন করলাম, এত দিন তাহলে দেখা করিস্ নি কেন ?

—কি জানো, য়ুনিভার্সিটিতে যেয়ে তোমার সাথে দেখা করতে কিছুতেই পা ওঠেনি। তুমি এখন এম. এ পড়ো। ভাল ছেলে। আর আমি—অথচ—একদিন তো একসাথেই পড়তাম। আর—ছাত্রও আমি ভালোই ছিলাম। তাই—

সাগরের গলা ভারী হয়ে এলো। ছুটি চোখে আহত স্বপ্নের বেদনার কালো ছায়া।

.

সাগরকে ধরেই রেখেছিলাম। মনের বাসনা, কিছুদিন আমার কাছেই থাক। দেখি যদি কোথাও একটা চাকরি-বাকরির সুবিধা করে দিতে পারি।

হায়রে ছুরাশা! তখনো বুঝিনি ওর ঘরের দেয়াল চিরদিনের জন্য ভেঙে গেছে।

একদিন সন্ধ্যার আগেই সাগরকে নিয়ে গেলাম ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে।

ছোট খালের ধারে তালগাছটার নিচে ছুজন বসেছি। কোন কথা নেই। সাগর আজ অত্যন্ত গম্ভীর।

ঝড়ের হাওয়ার আভাস কি পেয়েছে ওর যাযাবর মনের পাখি ?

বিছ্যুৎ প্রবাহের মতো প্রাণতোষবাবুর কথা মনে পড়ে গেলো।

প্রশ্ন করলাম, হ্যাঁরে সাগর, প্রাণতোষবাবুর কোন খবর জানিস ?

সহসা সাগর কোন জবাব দিলো না। চুপ করে বসে রইলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, জানি।

—কেমন আছেন আজকাল ?

—বোধ হয় ভালোই।

—কোথায় আছেন ? বাড়িতেই ?

—না। পথে।

—মানে ?

আমার প্রশ্নের উত্তরে সাগর বললো এক আশ্চর্য কাহিনী।

অথবা কাহিনী নয়, এক আশ্চর্য দিবাস্বপ্ন বুঝি।

সাগর বলতে লাগলো।

একদিন রাতে বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম।

গৈরিক বসন। হাতে দণ্ড। পুরীর সমুদ্রতীর বেয়ে হন্ হন্ করে চলেছেন।

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো তাঁর উপরে।

ঘুম ভেঙে গেলো। বুকের ভিতরটা আগুনের মতো জ্বলতে লাগলো।

পরদিনই বেরিয়ে পড়লাম বাবার সাথে দেখা করতে।

কিন্তু দেখা আর হলো না।

আর্তনাদ করে উঠলাম, বলিস কি ?

ঘাড় নেড়ে সাগর বললো জোর গলায়, না, ভয় পেও না। আজো তিনি বেঁচে আছেন।

—তবে ?

—তাঁর বাড়ি যেয়ে শুনলাম, শেষের দিকে কেমন উদভ্রান্তের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। কেবলি আমার নাম করতেন। সেই অবস্থায়ই একদিন গৃহত্যাগ করলেন।

সাগরের দু'চোখ জলে ভরে এলো। বাঁ হাতে চোখ মুছে আবার কথা বললো, গ্রামের অনেকেই আমাকে দেখে নতুন করে চোখের জল ফেললেন। বললেন, আহা তোমার খোঁজেই তিনি বেরিয়েছেন বাবাজী। শেষের দিকে কেবলি বলতেন, সাগর আমার নিশ্চয় সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। ভারতের নানা তীর্থস্থানে তাকে আমি একবার খুঁজে আসবোই।

একটা ঢোক গিলে সাগর চুপ করলো।

সব স্তব্ধ। দূর হতে ভেসে আসছে মোটরের কাঁপা শব্দ। কচিৎ কানে আসে পথচারীদের অস্ফুট আলাপ।

কথা বললাম, আর কখনো কি প্রাণতোষবাবুর দেখা পাস্ নি?

—না। কিম্বা হয়তো পেয়েছিলাম। শোনো তবে। মাঝে মাঝেই মনটা তখন বড় হাহাকার করে উঠতো। কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারতাম না। বেরিয়ে পড়তাম কোন তীর্থস্থানের উদ্দেশে। সেবার গেলাম পুরী। সকাল সন্ধ্যায় নিজের মনে সমুদ্রতীর ধরে ঘুরে বেড়াই। ঢেউয়ের হাহাকারের তালে বুকের রক্তে লাগে দোলা।

লক্ষ্য করলাম সাগরের সমস্ত শরীরটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো একবার।

সাগর বলতে লাগলো, একদিন আনমনে চলতে চলতে হঠাৎ খেয়াল হলো, আমার সামনেই পথ চলেছে আর এক সন্ন্যাসী। গৈরিক বসন। হাতে দণ্ড। দীর্ঘ দেহ একটু ঝুঁকে পড়েছে। গতি ক্লান্তিতে মন্থর।

অনেকদিন আগেকার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়লো। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সন্ন্যাসীর মূর্তি রহস্যময়।

মুহূর্তে সব বিচার-বুদ্ধি লোপ পেলো। আবেগভরে ডেকে উঠলাম, বাবা—বাবা—

সন্ন্যাসী ফিরে চাইলো।

অপরিচিত মুখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইলো আমার মুখের দিকে। তারপর দ্রুততর পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

তরঙ্গমুখর বেলাভূমিতে সেখানেই আমি বসে পড়লাম।

আমার কোলে উপুড় হয়ে পড়ে সাগর থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

রাত অনেক হলো। সাগরের হাত ধরে ইডেন গার্ডেন হতে বের হলাম।

পাশাপাশিই হাঁটছিলাম। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে এসে হঠাৎ সাগর হারিয়ে গেলো। অনেক খুঁজলাম। পেলাম না।

॥ ১০ ॥

বিষন্ন হৃদয়েই মেসে ফিরলাম।

এত দিন পরে দৈবাৎ যদিবা সাগরকে পেলাম, আবার এমন ভাবে তাকে হারিয়ে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেলো।

মেসে ফিরতেই স্থধীরবাবু বললেন, কৈ মশায়, আপনার বন্ধু কোথায়?

সব কথা খুলে বললাম।

অক্ষয়বাবু দিলখোলা মানুষ। হেসে বললেন, ও নিয়ে আপনি অনর্থক মন খারাপ করবেন না মশায়। ওর স্বভাবই ওই রকম। কোথাও বেশি দিন টিকতে পারে না। ওর লগ্নে বোধ হয় শনির অধিষ্ঠান আছে।

স্থধীরবাবু বললেন, লগ্নের আর দোষ কি বলুন। এই অল্প বয়সে যে ঝড় গেছে ওর জীবনের উপর দিয়ে তাতে যে কোন মানুষের পক্ষেই মাথা ঠিক রাখা দায়।

সেই দিনই কথাপ্রসঙ্গে আমি জানতে পারলাম সাগরের জীবনে মুখার্জি-পরিবারের অনুপ্রবেশের কাহিনী। অবশ্য ওরা তার যতটুকু জানতেন। বাকি সবটা জেনেছিলাম আরো অনেক দিন পরে সাগরের নিজের মুখ থেকেই।

মনে বড় অভিমান হয়েছিলো সেদিন। দুঃখও যে না পেয়েছিলাম তা নয়।

সংসারের ঝড়ে ছিটকে পড়েছি অনেক দূরে। তবু তো সাগর আমার এক কালের প্রিয়তম বন্ধু। এত দিন পড়ে দেখা হলো, এত কথা হলো, অথচ ওর জীবনের এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা ঘুণাক্ষরেও আমার কাছে উল্লেখ পর্যন্ত করলো না।

কিন্তু কেন যে সেদিন সাগর আমার কাছে সদাশিব-পরিবারের কথা উল্লেখ করে নি, কোন্ লজ্জা ওর বাগিন্দ্রিয়কে রেখেছিলো অসাড় করে, সে তথ্য আর একদিন সে নিজেই আমার কাছে উদ্ঘাটিত করেছিলো।

সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, বাইরের লোকের কাছে যাই বলুক ওর জীবনের কোন ঘটনাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা ওর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তার আংশিক বিবরণ ও আমাকে দিতে পারে নি। অথচ মিসেস্ মুখার্জির প্রতি স্বাভাবিক সম্ভ্রমবশতই তাঁর জীবনের সেই লজ্জাকর ঘটনাকে সেদিন সে আমার কাছে উদ্ঘাটিত করতে সংকোচ বোধ করছিলো।

বিশেষ করে তাঁর জীবনের যে শোচনীয় পরিণামের সঙ্গে তখন ওর সবেমাত্র পরিচয় ঘটেছিলো তারই বেদনাকর প্রভাবে ওর মন তখন এতদূর আচ্ছন্ন হয়ে ছিলো যে ঠিক সেই মুহূর্তে মিসেস্ মুখার্জির কাহিনী আমাকে বলাও ওর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

আর একদিন কিন্তু ও নিজে থেকেই সব কথা আমাকে খুলে বলেছিলো।

সাংবাদিক জীবনের পথে তখন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি।

নাইট ডিউটি।

শেষ রাত অবধি কলম চালাই আর ঘুমাই সকাল দশটা পর্যন্ত। রাত হয়েছে দিন, আর দিন হয়েছে রাত।

এমনি চলছে।

একদিন মার ডাকাডাকিতে বেলা আটটায়ই ঘুম ভেঙে গেলো।

ব্যাপার কি ?

মা বললেন, কে যেন তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

চোখ রগড়ে বললাম, কে সে ?

—কি জানি কে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, নিচে।

—আমি আর এখন নিচে নামতে পারবো না মা। কে এসেছে তাকে উপরে আসতে বলো না।

—না বাপু, তুই নিচেই যা। নিচের ভাড়াটের মেয়েটা বলছে, কে একজন ছোটলোকের মতো চেহারা। পায়ে জুতো নেই। গায়ে ছেঁড়া সার্ট। পরনে নোংরা ছেঁড়া কাপড়। তাই তো ওরা গেট দিয়ে ঢুকতেই দেয় নি।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলাম।

বাইরে দাঁড়িয়ে সাগর।

হতচ্ছাড়ার মত চেহারা।

বললাম, আরে, সাগর যে। আয়—আয়।

নিচের ভাড়াটেদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে সাগরকে উপরে নিয়ে এলাম। মাকে বললাম চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে।

কথায় কথায় সাগর টাকার কথা পাড়লো, অন্তত দশটা টাকা আমাকে না দিলেই চলবে না তরুণ, বড় আশা করে তোমার কাছে এসেছি।

জিব কেটে বললাম, মাসের শেষ এখন। টাকা তো ভাই হাতে নেই।

সাগর উৎসাহভরে পকেট থেকে এক গাদা ইন্সিওরের কাগজপত্র বের করে বললো, দিন দশেকের মধ্যেই প্রিমিয়াম বাবদ কতকগুলো টাকা আমার পাওনা হবে। সঙ্গে সঙ্গেই তোমার টাকা আমি দিয়ে যাবো।

আশ্রয়হীন জীবন-সমুদ্রে এই ময়লা কাগজগুলোই ওর শেষ তৃণখণ্ড। ওরা যে একান্তই অক্ষম আশ্রয়, এ কথা বলে ওকে কষ্ট দিতে পারলাম না।

বললাম, সে তো দশ দিন পরের কথা, এদিকে আমার পকেট যে গড়ের মাঠ। মাস কাবারে সব যে ফাঁক।

অসহায় ভাবে সাগর বললো, তাহলে কি হবে?

আশ্বাস দিয়ে বললাম, তুই যখন এসেছিস এতদূর কষ্ট করে, তখন গোটা দুই টাকা কোন মতে আমি দিচ্ছি এখন। এতেই কোন রকমে চালিয়ে নে এখনকার মতো।

সাগর এতেই খুশি হয়ে উঠলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কয়টা দিনের তো কথা। তারপর ইন্সিওরের টাকাটা একবার পেলে—

এমন সময় চা-জলখাবার এলো।

সাগরের মুখের কথা আর শেষ হলো না। আমার অনুরোধের অপেক্ষা না করেই খাবারের ডিসে হাত দিলো। হাত ধোবার জলের জন্য পর্যন্ত অপেক্ষা করলো না।

ওর খাবার রকম দেখে মনে হলো, অনেক দিন বুঝি ও পেট ভরে খায় নি।

বড় কষ্ট হল।

জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁরে সাগর, তুই আজকাল কি করিস, কোথায় থাকিস, কিছুই তো বললি না সেদিন। হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলি বল্ তো?

অপ্রস্তুত চোখ দুটি আমার দিকে মেলে ধরে সাগর বললো, বলবার মতো কিছু থাকলে তো বলব ভাই? যা পাই তাই খাই। যেখানে হয় থাকি। আর সেদিনকার কথা বলছ? সেদিন ইডেন গার্ডেনে তোমার পাশে বসে বারে বারেই ভয় হচ্ছিলো, পাছে আমার সব কথা তুমি জানতে চাও।

অভিমান করে বললাম, সেটা কি খুবই অন্যায় হতো?

—রাগ করো না ভাই। আমার সব কথা শুনলেই তুমিও বুঝতে পারবে যে আমার সব কথা খুলে বলা কতখানি শক্ত। বিশেষ করে তোমার মত বন্ধুর কাছে। আর যেখানে যাই বলি, তোমার কাছে তো খানিক রেখে খানিক বলতে পারি না।

মনের কৌতূহলকে আর চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, মিঃ সদাশিব মুখার্জি কে রে সাগর?

চকিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে সাগর বলল, মেসের সুধীরবাবু বুঝি বলেছে তোমাকে ?

—হ্যাঁ। তুই তো আর বললি না কিছু।

—ওরা আর কতটুকু জানে ভাই। কতটুকুই বা ওদের বলা যায়। সবই তোমাকে খুলে বলব তরুণ। বুকের সব বোঝা কারো কাছে হাল্কা না করে আমিও যেন আর পারছি না। কিন্তু আজ কি তোমার সময় হবে ?

সাগ্রহে বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে। আপিসে আজ আমার 'অফ্ ডে'। তুই বরং আজ দুপুরে আমার এখানেই খাবি। খাওয়া-দাওয়ার পর শুনব তোর লাবণ্য-বিজয় কাহিনী।

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলাম।

বিষন্ন কণ্ঠে সাগর বললো, বিজয় আর হলো কই ভাই। পরাজয়ই যে আমার ভাগ্যের লিখন।

॥ ১১ ॥

খাবার পরে সাগরকে নিয়ে বেরোলাম।

ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছুলাম দক্ষিণেশ্বর। বাস থেকে খানিকটা এগিয়ে গঙ্গার তীরে একটা নির্জন ঘাট। এক পাশে বিবেকানন্দ সেতু আর এক পাশে মাতা ভবতারিণীর মন্দির। সম্মুখে পড়ন্ত সূর্যের লাল আভায় ঝিলমিল শান্ত গঙ্গা।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে একেবারে জলের ধারে দুজনে বসলাম।

খানিক চুপ করে থেকে সাগর আরম্ভ করলো তার কাহিনী।

অনেকগুলো অধ্যায়ে বিভক্ত নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার বিচিত্র মিছিল।

তার অনেক অংশই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে এখানে ওখানে আগেই বলা হয়েছে। তাদের পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। যা বলা হয় নি তাই এখানে বলছি।

প্রথম কাহিনী মিঃ সদাশিব মুখার্জিকে নিয়ে।

বি. এল. পড়তে পড়তেই সদাশিবের বিয়ে হয় পাবনা জেলার একটি গণ্ডগ্রামে।

ছোট বেলায়ই তাঁর বাপ-মা মারা যান। পড়াশুনায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। নিজের চেষ্টায়ই বি. এল. পাশ করে মফঃস্বল শহরে ওকালতি ব্যবসা শুরু করেন।

পশার ভাল করে না জমা পর্যন্ত স্ত্রী সুলতা তার বাবার কাছে পল্লীগ্রামেই থাকতেন। কাজেই সদাশিবও ছুটিছাটা পেলেই শ্বশুর-বাড়িতে দু'দশ দিন কাটিয়ে আসতেন।

সেই অবস্থায়ই সুলতার কোল জুড়ে এলো লাবণ্য। সদাশিবের শ্বশুর-বাড়ি যাতায়াত আরো বেড়ে গেলো।

সুলতার গ্রাম-সম্পর্কে এক বিধবা বোন থাকতো পাশের বাড়িতে। প্রায় তার সমবয়সী। সখীর মত। নাম শীলা।

সদাশিব শ্বশুরবাড়ি এলেই জামাইর আদর-আপ্যায়নের জন্য যে বাড়তি কাজের চাপ পড়তো সেটা সামলাবার জন্য প্রায়ই শীলার ডাক পড়তো এ-বাড়িতে।

সেই সুবাদেই সদাশিবের সঙ্গে শীলার প্রথম পরিচয় ঘটে।

শ্যালী-ভগ্নিপতির সম্পর্ক। হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ দুজনের পরিচয় অন্তরঙ্গতার পথ ধরলো।

সুলতা প্রথমটা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। যখন বুঝতে পারলেন আভাষে-ইঙ্গিতে, তখনই অকস্মাৎ উপর থেকে তার ডাক এসে পড়লো।

কয়েক দিনের জ্বরে সুলতা মারা গেলেন।

খবর পেয়ে সদাশিব এলেন শ্বশুর বাড়িতে।

আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে দেখে সহানুভূতির চোখের জল ফেললো।

কিন্তু সেই বিপদের দিনে যে সব দিক দিয়ে ঘিরে রাখলো সদাশিবকে সেবা ও সহানুভূতি দিয়ে সে শীলা।

লাবণ্যকে সে যেন মায়ের যত্নেই কোলে তুলে নিলো।

সদ্য কন্যাশোকাতুর প্রৌঢ় দম্পতি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

লাবণ্যর সেবা-পরিচর্যার সেতু ধরে শীলা ও সদাশিব পরস্পরের দিকে দ্রুত বেগে অগ্রসর হতে লাগলো।

তেমনি এক দিনের কথা।

শহর থেকে সেই দিনই সদাশিব এসেছেন শ্বশুর বাড়ি।

যথারীতি শীলারও ডাক পড়েছে এ-বাড়িতে। অবশ্য আজকাল

আর সে ডাক পড়ার অপেক্ষা রাখে না। লাবণ্যর দেখাশুনার জন্য এ-বাড়িতে আসা যাওয়া তার নিত্যকর্মে দাঁড়িয়েছে।

রাতে খাওয়া শেষ করে শুতে যাবার আগে সদাশিব বললেন, আমার ঘরে এক গ্লাস জল দিয়ে এসো তো শীলা। আজকাল আবার রাতে মাঝে মাঝে জলতৃষ্ণা পায়।

মুচকি হেসে শীলা ফিস্ ফিস্ করে বললো, তৃষ্ণা যখন পায় তখন তো জল দিতেই হবে। আপনি শুতে যান। আমি জল দিয়ে আসব।

কী রহস্য ছিলো শীলার হাসিতে, সদাশিব যেন নতুন চোখে তাকে দেখলেন সেই মুহূর্তে। বুঝি তাকে আবিষ্কার কবলেন নতুন করে।

—আচ্ছা, বলে তিনি শোবার ঘরে চলে গেলেন।

খানিক পরে এক গ্লাস জল হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো শীলা। মিষ্টি হেসে বললো, আপনি কী বলুন তো?

শীলার কথার ধরনে শিহরণ খেলে গেলো সদাশিবের বুকে। বললো, কেন বলো তো? কি করলাম আবার?

—অমনি করে তেষ্টা পায় বলে জল চাইতে হয় বুঝি? ওরা কেমন সব হাসাহাসি করছিলো। আমার লজ্জা করে না?

—কিন্তু জল না চাইলে তো তুমি আসতে না এ ঘরে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে শীলা বললো, এত রাতে এ ঘরে তো আমার আসবার কথা নয় মুখুজ্জেমশায়। আর আসবই বা কেন?

—কেন আসবে? বা একেবারেই আসবে কি না সে তুমিই জানো। তবে আমার একটু দরকার ছিলো বলেই তোমাকে ডেকে-ছিলাম, জলটা ছল মাত্র। এতে যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে তো তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

সদাশিবের গলায় প্রচ্ছন্ন অভিমানের আভাষ। সেটা বুঝতে পেরে শীলা বললো, এই দেখো, এতেই আবার রাগ হলো বাবুর। আসব না কি বলেছি নাকি? নিন, এখন বলুন কী দরকারে ডেকেছেন।

বিছানা থেকে উঠে সুটকেসের ভিতর থেকে একখানা সরু পাড় মিহি ধুতি বের করে শীলার দিকে এগিয়ে দিয়ে সদাশিব বললেন, এই নাও।

শীলা বললো, কাপড় দিয়ে কি হবে?

—তুমি পরবে?

—ছিঃ ছিঃ, এ আবার আনতে গেলেন কেন?

—আমার ইচ্ছে হলো তাই।

কাপড়খানা হাতে নিয়ে শীলা বললো, কিন্তু এ ইচ্ছা তো ভাল নয় মুখুজ্জেমশায়, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে যে।

—পাঁচ জনের কথায় কী যায় আসে শীলা? তারা কি আমার মনের দিকে চাইবে?

পরিহাসে লঘু হয়ে উঠলো শীলার কণ্ঠ, ওমা, মুখুজ্জেমশায় কি আবার মনের কারবার খুলেছেন নাকি? শহরে বন্দরে কোন মনের মানুষের খোঁজ পেয়েছেন বুঝি?

—শহরে কেন শীলা? এই গাঁয়ে কি পাওয়া যায় না?

ফিস্ ফিস্ করে কথাগুলো বললেন সদাশিব। সহজ ভাবেই বললেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলো শীলা, মুখুজ্জে-মশায়!

চকিতে মুখ তুললেন সদাশিব। বললেন, কী হলো?

শীলা তখন থরথর করে কাঁপছে। দুটি চোখ অশ্রু-ছলছল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করছে সে।

সদাশিব আবার বললেন, কী হয়েছে শীলা? তুমি ওমন করছ কেন?

আবেগাপ্লুত নিম্নকণ্ঠে শীলা বলল, মানুষের মন নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলবেন না মুখুজ্জেমশায়। ভুলে যাবেন না যে আমি বিধবা।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে পা বাড়ালো শীলা।

চাপা গলায় সদাশিব বললেন, যেয়ো না শীলা। শোন—শোন। ছিনিমিনি খেলতে আমি চাই নি। এ আমার মনের কথা—

—না না না—

বলতে বলতে উদ্গত অশ্রুপ্রবাহকে কোন মতে সম্বরণ করে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো শীলা।

যুগপৎ হরিষে ও বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন সদাশিব।

শীলার সহজাত সংস্কার আর সদাশিবের স্বাভাবিক কুণ্ঠার প্রাচীরে সেদিনকার মতো আরো অনেক দিন প্রতিহত হলেও শীলা-সদাশিবের নিষিদ্ধ প্রেমের দুর্বার বেগকে বেশি দিন অবরুদ্ধ রাখা গেলো না। বাঁধভাঙা বন্যাস্রোতের মত দুই কূল প্লাবিত করে সে নিজের পথ করে নিলো।

এক দিন রাতের অন্ধকারে শীলা ও লাবণ্যকে নিয়ে সদাশিব পালিয়ে গেলেন শ্বশুরবাড়ি থেকে।

শহরে নিজের পরিচিত কর্মস্থলেও আর ফিরে গেলেন না।

সবাইকে নিয়ে ডেরা বাঁধলেন বাংলা দেশের এক প্রত্যন্ত শহরে।

সেখানেই শীলা হলেন মিসেস্ মুখার্জি।

লাবণ্যর মা।

অনাদৃতা এক বালবিধবা স্বামী-কন্যার সাজানো সংসার পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

কিন্তু তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হতেও বিলম্ব হলো না।

বালবিধবার ভস্মাচ্ছাদিত কামনার আগুন যেন অনুকূল বাতাস পেয়ে সহস্র লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠলো।

তার তীব্র উত্তাপ সদাশিবের স্বভাবতঃ রুচিবান মনকে যেন ঝল্‌সে দিলো। সে উত্তাপ, সে অগ্নিদাহ সদাশিব বেশী দিন সহ্য করতে পারলেন না।

সদাশিব চান ত্যাগের মাধুর্যে মণ্ডিত স্বাভাবিক গার্হস্থ্য জীবন।

মিসেস্ মুখার্জি চান উদ্দাম ভোগবিক্ষুব্ধ উত্তাল জীবন-সমুদ্রে আকণ্ঠ অবগাহন।

সেইখানেই বাধলো বিরোধ।

প্রথমে সামান্য খিটিমিটি। পরে সরব ঘোষণা।

সদাশিব স্বভাবতই শান্ত নির্লিপ্ত প্রকৃতির মানুষ। অল্প দিনেই বুঝতে পারলেন, শীলার কামনাক্ষুব্ধ জীবনকে তাঁর নিজের কাম্য পথে পরিচালিত করা যাবে না। তাই সে ব্যর্থ চেষ্টায় ব্রতী না হয়ে তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিতে লাগলেন মিসেস্ মুখার্জির কাছ থেকে।

মিসেস্ মুখার্জিও প্রথমটায় আহত হলেন, ক্ষুব্ধ হলেন, সজোরে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করলেন।

কিন্তু সদাশিবের মন তখন একটা শম্বুক-খোলসের কঠিন আবরণে তাঁর কাছে ঢাকা পড়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও সে-মনের কাছে তিনি পৌঁছুতে পারলেন না।

ব্যর্থ প্রচেষ্টায় বার বার সেই শম্বুক-কাঠিন্যের প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে শেষটায় তিনিও বেছে নিলেন নিজের পথ। সহজ গার্হস্থ্য জীবনের দরজায় খিল এঁটে বরণ করে নিলেন সোসাইটি মহিলার বহির্জীবন।

শীলা দ্বিতীয় বার মিসেস্ মুখার্জি হলেন।

ক্লাব আর পার্টি, সমিতি আর সম্মেলন নিয়েই মেতে রইলেন।

এই আবহাওয়ার মধ্যেই লাবণ্য ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো।

আর ঠিক সেই সময়েই সাগরের আবির্ভাব হলো মুখার্জি-পরিবারে।

এই পর্যন্ত বলে সাগর চুপ করলো।

চেয়ে দেখি, ওর সারা মুখটা থম্ থম্ করছে।

বুঝতে পারলাম, অতীতের রোমন্থনে সেদিনের সুখ এবং দুঃখ

দুয়েরই অনুভূতি নতুন করে ওর মনকে উদ্বেলিত করে তুলেছে।

সামনে তাকালাম।

সূর্য অনেক ক্ষণ অস্ত গেছে।

আঁধারের একটা পাতলা আবরণ নেমে এসেছে গঙ্গার বুকে।

ভবতারিনীর মন্দির থেকে ভেসে আসছে আরতির বাজনা।

আমিও চুপ করে ওর বিচিত্র জীবন-কথাই ভাবছিলাম। আলোর একটা তীব্র ছটা ছড়িয়ে দিয়ে ব্রীজের উপর দিয়ে একটা মোটর যাচ্ছিলো। তারই শব্দে চমক ভাঙলো।

সাগরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম, একটা কথা জিজ্ঞেস করব সাগর ?

—বলো।

—মুখার্জি-পরিবারের এই গূঢ় অতীত জীবনের কথা তুই জানলি কেমন করে ? সদাশিববাবু তোকে তো ছেলের মত দেখতেন। তাঁর পক্ষে তো এ কাহিনী তোকে বলা সম্ভব নয়।

ম্লান হেসে সাগর বললো, সেও আর এক কাহিনী। বলতে যখন বসেছি তখন সবই তোমাকে বলব। কিছুই বাদ দেব না।

সাগর বলতে আরম্ভ করলো আবার।

॥ ১২ ॥

সাগরের কথা :

তোমাকে কি বলব তরুণ, বাবাকে ছেড়ে এসেছিলাম যেদিন দুঃসহ দুঃখে সেদিন বুকখানা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু দুঃখের সমুদ্র যে আরও কত উত্তাল হয়ে মানুষের বুকে আঘাত করতে পারে, আরও কত তীব্র অসহ্য হতে পারে যন্ত্রণার আগুন, সেটা বুঝতে পারলাম সেই দিন যেদিন মিঃ মুখার্জির বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম।

সেই কালরাত্রি।

সে রাত্রি যেন আজও একটা কুটিল দুঃস্বপ্নের মত আমার মনের উপর চেপে বসে আছে।

মিঃ মুখার্জি ঘর থেকে চলে গেলেন। মিসেস্ মুখার্জিও ধীর পায়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

ক্ষোভে, লজ্জায়, অপমানে আমার বুকের ভিতরটা অসহ্য দুঃখে মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগলো। মাথার ভিতরে জ্বলতে লাগলো কালানল।

কী ভাবলেন আমাকে পিতৃপম মিঃ মুখার্জি!

এই জঘন্য কাহিনী যখন শুনবে লাবণ্য, আমার প্রতি কী তীব্র বিতৃষ্ণা আর ঘৃণায় ভরে যাবে তার মন!

লাবণ্যর বিশ্বাসও আমি হারালাম!

তাহলে আর কী নিয়ে থাকব এই পৃথিবীতে?

বাবার গভীর সন্তান-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি মিথ্যা চোর অপবাদে।

মিঃ ও মিসেস্ মুখার্জির স্নেহ আমাকে বুঝি ভুলিয়ে দিয়েছিলো সে দুঃখ।

লাবণ্যর ভালবাসার অমিয় নির্ঝরে অবগাহন করে বুঝি জুড়িয়েছিলো মনের সে তাপ।

আজ যে আবার সব হারালাম। এই বিশাল বিশ্বে একেবারেই দেউলে হয়ে গেলাম।

উপুর হয়ে বিছানায় পড়ে কাঁদলাম কিছুক্ষণ। হৃদয়ের ভার বুঝি কিঞ্চিৎ লাঘব হলো।

তারপর উঠলাম। এক টুকরো কাগজ টেনে যা মনে এলো লিখলাম দু'লাইন।

লাবণ্যর জন্য মনটা হু হু করে উঠলো।

মনকে চাবুক মারলাম। বৃথা এ হাহাকার। লাবণ্য আর মুখ তুলে চাইবে না তোমার কালো মুখের দিকে। লাবণ্যর সে উপেক্ষা ও ঘৃণার কশাঘাত থেকে যদি বাঁচতে চাও তো পালাও—পালাও।

দ্রুতপায়ে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম।

থমথমে কালো কালো বাড়িটা যেন একটা ভৌতিক ত্রাসের মত আমাকে তাড়া করে এলো।

সাগর বোধ হয় একটু থেমেছিলো কথার মাঝখানে। আমি মুখ তুলে তাকালাম। ওর ক্লিষ্ট দুর্বল দেহটা থর থর করে কাঁপছে।

ওর মাথায় হাত দিয়ে বললাম, বলতে যদি তোর কষ্ট হয় আজ তাহলে থাক সাগর। আর একদিন শুনব তোর কাহিনী।

সাগর বললো, না ভাই, কষ্ট আর কি। বরং তোমাকে সব কথা বলতে পেরে আমি যেন অনেকটা হাল্কা হতে পারছি। শোনো তারপর।

বেশ কিছুদিন পরের কথা।

পৃথিবীর পথে পথে তখন অনেক ঘুরেছি। অনেক কণ্টক-পথে

চলতে চলতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পদতল। আরক্ত হয়েছে পৃথিবীর মাটি।

সাময়িক আশ্রয় পেয়েছি কলকাতারই একটা ছোট স্কুলে।

প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াই। স্কুলেরই একটা খুপড়িতে থাকি। আহারাদি করি স্কুলের দরোয়ানের সঙ্গে।

স্মৃতির বৃশ্চিক মাঝে মাঝে হুল ফোটাতো। মনটা হু-হু করেও উঠতো। তারপর এক সময়ে নিস্তেজ হয়ে আসতো মন।

ভাবতে চেষ্টা করতাম, সে-সাগর তো আমি নই। সে তো অন্য মানুষ। তার চোখে ছিলো স্বপ্ন। মনে ছিলো আশা। বুকে ছিলো অতলান্ত ভালবাসা।

সে-সাগর তো আমি নই। আমি তো আশাহীন স্বপ্নহীন সামান্য স্কুল-শিক্ষক।

কিন্তু ভাল থাকা বুঝি বিধাতাপুরুষ আমার কপালে লেখেন নি।

আকস্মিক ভাবেই একদিন মিঃ মুখার্জির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেলো।

স্কুলের ছেলেদের একটা পার্টির সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম দেওঘরে।

প্রায়ই বিকেল বেলাটা আমি একা একাই ঘুরে বেড়াতাম।

সেদিনও বেরিয়েছিলাম।

সারা বিকেলটা নন্দন পাহাড়ে কাটিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে নিচে নেমে আসছিলাম।

সূর্য তখন অস্ত যায় যায়।

এক পাশে একটা পাথরের চাঁইয়ের উপরে বসে অস্ত সূর্যের দিকে চেয়ে ছিলেন একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

পিছন থেকে দেখেও কেন যেন মনে হলো, লোকটি আমার পরিচিত।

মনে হতেই বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

যদি যা ভেবেছি তাই হয়!

দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেলাম।

সামনে যেয়েই চম্‌কে উঠলাম।

মুদ্রিত নয়নে ধীর অকম্পিত ঋষির মত বসে আছেন মিঃ মুখার্জি। সারা মুখ বলিরেখায় আচ্ছন্ন। বার্ধক্যের স্পষ্ট পদক্ষেপ। কেশবিরল মাথায় কাশ ফুলের আলপনা। মৃদু বাতাসে সাদা চুলগুলো উড়ছে।

এই কয়েক বছরেই অনেক বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন।

কাছে যেয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম।

—কে?

আঁতকে উঠে আমার দিকে তাকালেন তিনি।

আমিও তাকালাম।

অস্পষ্ট ঘোলাটে দুটি চোখ যেন আনন্দে নেচে উঠলো এবার। কাঁপা গলায় বললেন, তুমি—তুমি সাগর!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সাগর।

অপলক চোখে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, এত দিনে কি তোমার সময় হলো?

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে চম্‌কে উঠলাম। একটা চাপা ক্রোধের আভাষ যেন কানে বাজলো। তবে কি এত দিনেও তিনি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন নি?

তখন বুঝতে পারি নি, যে অনুভূতি তাঁর কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়েছিলো সেটা ক্রোধ নয়—অভিমান।

বললাম, আপনি কি আজো আমাকে ক্ষমা করতে পারেন নি?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ওরে না না, ক্ষমার কোন কথাই তো এর মধ্যে নেই। কোন অপরাধই তুই করিস নি। আমি শুধু এই কথাটাই আজও ভেবে পাই নে যে সেই দুর্ঘটনার রাতে তুই কেমন করে আমাকে এতটা ভুল

বুঝলি ? তুই কেন আমার সঙ্গে একটি বার দেখা পর্যন্ত না করে এত বড় মিথ্যে অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলি ? আমি যে তার কিছুক্ষণ পরেই আমার সর্বস্ব তোকে দেবার জন্য তৈরি হয়ে এসেছিলাম।

মনে পড়লো, এর আগে মিঃ মুখার্জি কোন দিন আমাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেন নি। এই আনন্দেই মন নেচে উঠলো।

আর একবার তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। বললাম, আমার ভাগ্য যে আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন।

—ওরে বোকা ছেলে, তোকে ক্ষমা করব কিরে ? তোর কাছে অপরাধী তো আমরাই।

আমরাই !

তাহলে মিসেস্ মুখার্জিকেও তিনি ক্ষমা করেছেন ! তাঁর অপরাধকে দুজনে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার বুকের ভিতর থেকে।

তিনি বললেন, আমরা কাছেই থাকি। বেলা বাগানে। আয় আমার সঙ্গে।

তাঁর পিছু পিছু হাটতে হাটতে চললাম।

মনে পড়লো, অনেক কাল আগে আর একদিনও এমনি করে তাঁর পিছু পিছু হেটে মফঃস্বল শহরের একটা বাড়িতে যেয়ে প্রথম উঠেছিলাম। সেদিন আর এদিনে কতো পার্থক্য !

বুকের ভিতর একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য। দুরু দুরু কম্পন। অভিসার-যাত্রায় যেন চলেছি তারকাচিহ্নহীন অন্ধকারে।

লাবণ্যর কথা মনে পড়ছে।

জানি না, এতদিন পরে সে-মুখে কিসের ছায়া দেখতে পাব।

চমক ভাঙলো মিঃ মুখার্জির ডাকে।

—লাবণ্য, আলোটা ধর তো মা। ছাখ, কাকে ধরে এনেছি।

—যাই বাবা।

একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো লাবণ্য।

বললো, কে বাবা ?

পর মুহূর্তেই আমার দিকে তার চোখ পড়লো।

লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় তার মুখে দেখতে পেলাম বিচিত্র ছায়া-ছবি।

আনন্দের রাঙা আবির যেন ছড়িয়ে গেলো সারা মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেলো সে লালিমা। দেখতে দেখতে ম্লান হয়ে গেলো সারা মুখ। ইস্পাৎ-কঠিন হয়ে উঠলো তার দেহ। আশ্চর্য শক্তিতে নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিলো লাবণ্য। যতটুকু এগিয়ে এসেছিলো ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। এক পাও এগিয়ে এলো না আর আমার দিকে। সামান্যতম সম্ভাষণও জানালো না আমাকে।

সাদরে আহ্বান জানালেন মিঃ মুখার্জি।

—এসো বাবা, ঘরে এসো। বাইরে হিম পড়তে শুরু করেছে।

ঘরের ভিতরে যেয়ে বসলাম।

লাবণ্য লণ্ঠনটা রেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো।

যাবার বেলায় বলে গেলো, তোমরা বসো বাবা। আমি এখুনি চা নিয়ে আসছি।

চারদিক চেয়ে দেখলাম।

ঘরখানি নিরাভরণ, কিন্তু রুচিসম্মত।

বুঝলাম, লাবণ্যর কল্যাণ-হস্তের স্পর্শ আছে এর গায়ে।

রোমাঞ্চ জাগলো হৃদয়ে। আমার জন্যও কি সে হস্ত ও প্রসারিত করবে না ?

চা খেতে খেতে অনেক কথাই হলো।

মিঃ মুখার্জির শরীরের কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি একটা অস্পষ্ট জবাব দিলেন, আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি ভালই আছি।

লাবণ্যর কথাই তিনি পঞ্চমুখ হয়ে বলতে লাগলেন। ইতিমধ্যে

সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। বাংলা দেশের একটা ছোট শহরের স্কুলে চাকরিও নিয়েছে। কিছু দিনের ছুটি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে এসেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, মিসেস্ মুখার্জির কথা তিনি ভুলেও একবার উল্লেখ করলেন না।

কৌতূহল যতই হোক, স্বাভাবিক সংকোচ বশতঃই আমিও তাঁর কথা জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না।

অথচ বার বার আমার মনে হচ্ছিলো যে তাঁর কথা জিজ্ঞেস না করা আমার পক্ষে একান্তই অশোভন।

সব সংকোচ কাটিয়ে এক সময়ে বললাম, মাসিমা কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না।

মিঃ মুখার্জি বললেন, তিনি পাশের ঘরেই আছেন। দেখবে চলো।

দরজার পর্দাটা সরিয়ে তিনি পাশের ঘরে ঢুকলেন।

তাঁর পিছনে পিছনে আমিও ঢুকলাম।

ঘরখানি বেশ বড়। এক পাশে টেবিলের উপর একটা ল্যাম্প জ্বলছে। পাশে ফুলদানীতে টাটকা ফুল।

ঘরের দু'পাশে দুটি শয্যা।

তারই একটিতে গলা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে চিৎ হয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন মিসেস্ মুখার্জি।

চম্‌কে উঠলাম।

কোটরগত চোখ। তোবড়ানো গাল। শিথিল কুঞ্চিত চামড়ার আবরণ ভেদ করে ঠেলে উঠেছে গাল ও হনুর কংকাল।

শুধুমাত্র মুখখানি দেখলেই বোঝা যায় যে ঐ চাদরের আবরণে যে দেহটা ঢাকা রয়েছে সেটা মানুষ নয়, একটা কংকাল মাত্র।

ভীত বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকালাম মিঃ মুখার্জির দিকে।

আমার মনের প্রশ্নটা তিনি বুঝতে পারলেন। নিচু গলায় বললেন, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরে দেখা করো। চলো ও ঘরে যাই।

আবার বাইরের ঘরে যেয়ে বসলাম দুজনে।

কোন কথা নেই কারো মুখে।

লাবণ্য সেই যে চা দিয়ে গেছে আর আসে নি এ ঘরে। হয়তো গৃহকার্যে ব্যস্ত ছিলো।

শুক্লা তিথির জ্যোছনা উঠেছে বাইরে।

বাড়ির সামনেই দূরবিস্তার মাঠ। খোলা দরজা দিয়েই চোখে পড়ে চাঁদের আলোয় ধোয়া মোহময় নন্দন পাহাড়।

সেই দিকেই চেয়েছিলাম বিমূঢ়ের মত।

কথা বললেন মিঃ মুখার্জি, কি জানো সাগর, বড়ই দুর্ভাগিনী উনি। জীবনে কোন দিন সুখ-শান্তির মুখ দেখেন নি। আমরা মানুষের বাইরের ব্যবহারটা দেখেই তার বিচার করি। মন্দ বলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নি। কিন্তু কেন যে একটা মানুষ মন্দ হয়, কোন্ বিরুদ্ধ ঘটনার সংঘাতে ধীরে ধীরে নিন্দার পংকে ডুবে যায়, সেটা কি আমরা একবারও ভেবে দেখি।

কিছুই বুঝতে পারলাম না তাঁর কথার উদ্দেশ্য। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

আবার তিনি কথা বললেন, তোমার মাসিমার কথাই বলছি। যেদিন তুমি চলে গেলে সেই রাতেই হঠাৎ উনি ফিট হয়ে পড়েন। তারপর থেকেই উনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু। একেবারে শয্যাশায়ী। পাশ ফিরিয়ে না দিলে পাশ ফিরতে পারেন না। খাইয়ে না দিলে খেতে পারেন না।

—বলেন কি ?

—হ্যাঁ বাবা। নিজের চোখেই তো দেখলে কী হাল ওর হয়েছে।

—ওঁর চিকিৎসা কি হচ্ছে ?

—আমার সাধ্যমত চিকিৎসার ত্রুটি আমি করি নি সাগর। প্রথমে শহরের ডাক্তার-বদ্যি। তারপর কলকাতা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শেষটায় ডাক্তার বললেন চেঞ্জে নিয়ে যেতে।

যদি তাতে কোন ফল হয়। সেই থেকেই এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মাস ছয়েক হলো এসেছি দেওঘরে।

—কিন্তু ওর সেবা শুশ্রূষার কি ব্যবস্থা?

—স্কুলের ছুটিছাটা পেলেই লাবণ্য এসে সব ভার নেয়। নইলে বাকি সময়ে বুড়ো বয়সে আমিই যত দূর যা পারি করি।

চকিতে মনে পড়লো, পাশের ঘরে দুটি শয্যা রয়েছে দু'পাশে। পক্ষাঘাতে পঙ্গু স্ত্রীর সব সেবা যত্নের ভার এই বৃদ্ধ মানুষটি একলা হাতে তুলে নিয়েছেন, দিনের পর দিন মাসের পর মাস নিরলস ভাবে তাঁর সেবা করে চলেছেন, ভাবতেই যেন মাথাটা আপনাতেই তাঁর পায়ের কাছে নত হয়ে এলো।

অথচ সেদিন আমি কল্পনায়ও ভাবতে পারি নি যে এই পত্নীব্রত পালন করা তাঁর পক্ষে কত কঠিন, কতখানি ক্ষমাসাধ্য।

যে নারী জঘন্য বিশ্বাসহীনতায় একদিন কালি লেপে দিয়েছিলো তাঁর মুখে, ক্ষমাসুন্দর হৃদয়ে তার সব অপরাধ ক্ষমা করে তারই পঙ্গু জীবনের সঙ্গে নিজেকে এমন ভাবে জড়িয়ে রাখা যে কত বড় হৃদয়ের পক্ষে সম্ভব আজ সে কথা যত ভাবি ততই দূর থেকে তাঁকে স্মরণ করে বার বার প্রণাম জানাই।

কিন্তু সে কথা থাক। মিঃ মুখার্জি তাঁর জীবনের সেই অতীত অধ্যায়টিকে একদিন কেমন করে নিজের হাতে লিখেই আমাকে জানিয়েছিলেন সেই কাহিনীই তোমাকে বলছি।

সেদিন রাতে আর আমার লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয় নি।

মিসেস্ মুখার্জির সঙ্গেও না।

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

কেন লাবণ্য এমন করে আমাকে এড়িয়ে গেলো? কেন অন্ততঃ একটু স্মিত হাসির মাধুর্য ছড়িয়ে আমাকে বরণ করলো না এত দীর্ঘ বিরহের পরেও?

তবে কি ওর মায়ের অসুস্থতার সঙ্গে আমার আকস্মিক অন্তর্ধানকে জড়িয়ে কুৎসিৎ কোন ভাবনার বিষ ছড়িয়ে আছে ওর মনে?

সত্যি সত্যি কি ও আমাকে অবিশ্বাস করেছে?

ওর মন হতে মুছে গেছে আমার প্রাতির স্পর্শের ক্ষীণতম দাগ?

এমনি নানা আশংকায় দোদুল্যমান মন নিয়ে বেশ কয়েক দিন আমি আর বেলা বাগানে যাই নি।

একদিন দুপুর বেলায় মিঃ মুখার্জি নিজেই হাজির হলেন আমাদের আস্তানায়।

চাদর মুড়ি দিয়ে আমি শুয়েই ছিলাম। একটি ছেলে এসে খবর দিলো, একজন বুড়ো ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজছেন স্যার।

তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম।

সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ মুখার্জি।

বড়ই অপ্রস্তুত বোধ করলাম।

আমি কিছু বলবার আগেই তিনি কথা বললেন, বিশেষ কোন কাজ না থাকে তো তৈরি হয়ে এসো। একটু বেড়িয়ে আসি।

বললাম. না না, কাজ আর কি। আপনি উপরে উঠে বসুন। আমি এক্ষুনি আসছি।

—আমি বেস আছি। তুমি তাড়াতাড়ি এসো।

জামাটা গায়ে দিয়ে চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

হাটতে হাটতে পৌঁছলাম বিদ্যাপীঠের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে।

একেবারে পশ্চিম কোণের একটা গাছের নিচে তিনি বসলেন।

আমিও বসলাম পাশে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

কথা বললেন মিঃ মুখার্জি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। শুধু উনি যতদিন শেষ নিঃশ্বাস না ফেলছেন ততদিন কোনক্রমে খাঁচাটাকে খাড়া রাখতে পারলেই আমার কাজ শেষ। আর কোন দায়ই

পৃথিবীতে আমার নেই। আছে কেবল লাবণ্য। আজো তাকে পাত্রস্থ করতে পারি নি। একদিন সংকল্প করেছিলাম তোমার হাতেই ওকে দিয়ে যাব। তারপরই সব গোলমাল হয়ে গেলো। কোথায় বা রইলাম আমরা আর কোথায় বা রইলে তুমি। উঃ! সে যে কী দুঃসহ দিনই আমাদের গেছে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, তারপরেও লাবণ্যকে পাত্রস্থ করবার চেষ্টা আমি করেছিলাম। কিন্তু ও রাজী হয় নি। তুমি তো ওকে জানো। এমনি তে খুবই ভাল; কিন্তু জিদ যা ধরবে তার থেকে ওকে সরানো দায়। আর আমিও জানি, অহেতুক জিদ ও করে না। তাই এতদিন আমিও চুপ করেই ছিলাম। কিন্তু—

কথার মাঝেই হঠাৎ চুপ করে থেকে তিনি আমার দিকে তাকালেন। কিসের যেন প্রত্যাশা জ্বল জ্বল করছে তাঁর চোখে।

আমারও বুকের ভিতরে নতুন আশার কল্লোল-গান।

তবে কি আমার আশায়ই পথ চেয়ে বসে আছে লাবণ্য!

আমাকে সে অবিশ্বাস করে নি। ভুল বোঝে নি!

—দেখো সাগর, তোমার এবং আমার জীবনের একটা চরম প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছি। যা জিজ্ঞেস করছি তার স্পষ্ট সত্য উত্তর আমি আশা করি তোমার কাছ থেকে।

—বলুন।

—লাবণ্যকে তুমি আজো ভালবাস?

মুখ তুলে তাকালাম শুধু। হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারলাম না।

—লজ্জা বা সংকোচের সময় এখন নয়। অসংকোচে তোমার মনের কথা আমাকে খুলে বল। লাবণ্য আমার মেয়ে। কিন্তু তুমিও তো আমার সন্তানতুল্য।

মাথা নিচু করে বললাম, বাসি।

—তাকে বিয়ে করতে রাজী আছ? আজীবন তাকে সঙ্গিণী সহধর্মিণী করে রাখবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, আপনাদের আশীর্বাদ পেলে নিশ্চয় পারব।

—আমার আশীর্বাদ তুমি পাবে।

অজ্ঞাতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, আর মাসিমার ?

চমকে উঠলেন মিঃ মুখার্জি। কোথায় যেন একটা আঘাত লেগেছে তাঁর মনে। শক্ত গলায় বললেন, তাঁর কথা আমি জানি না। তবে একটা কথা জেনো, তোমার আর লাবণ্যর জীবনে অনেক দিন থেকেই তিনি মৃত।

—কী বলছেন আপনি ?

—দেখো বাবা, জীবনটা নাটকও নয়, নভেলও নয়। কিন্তু তার চেয়েও রহস্যময়, তার চেয়েও বিস্ময়কর।

পকেট থেকে একখানা লম্বা মুখ-আটা খাম বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, লাবণ্যকে আমি সব কথাই বলেছি। তোমার জন্য সব লিখে রেখেছি এই চিঠিতে। এটা পড়েও যদি তোমার প্রতিশ্রুতিতে তুমি মনে প্রাণে অবিচল থাকতে পারো, তাহলে আমাকে জানিও। যে কোন শুভদিন দেখে তোমাদের চার হাত এক করে দিয়ে আমরা দুজনে চলে যাব অনেক দূরে।

—আমাদের ছেড়ে আপনারা চলে যাবেন ?

—হ্যাঁ বাবা, চলে যেতেই হবে। আমরা মৃত্যুপথযাত্রী। তোমাদের সম্মুখে জীবনের পথ। জীবন-সমুদ্র মন্থন করে আমরা পেয়েছি শুধুই বিষ। সেটা আমাদের ভাগ্যলিপি। কিন্তু সে বিষে তোমাদের জড়িয়ে রেখে লাভ কি ?

মুখ তুলে তাকালাম।

পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা এসে পড়েছে মুখে। সাদা চুলগুলো উড়ছে মৃদু হাওয়া। ক্ষমাসুন্দর কী অপূর্ব সৌম্য মূর্তি।

কম্পিত হাতে খামখানা নিয়ে তাঁর পায়ের উপর মাথা রাখলাম। একখানি কল্যাণ হস্ত আমার মস্তক স্পর্শ করলো সুগভীর স্নেহে।

॥ ১৩ ॥

সেই চিঠি থেকেই সাগর জানতে পেরেছিলো মিঃ ও মিসেস্ মুখার্জির অতীত জীবনের কথা।

জানতে পেরেছিলো, তার পালিয়ে আসবার রাতেই একটা আর্তনাদ করে বন্ধ দরজার উপর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন মিসেস্ মুখার্জি। সেই থেকেই পর পর হিস্টেরিক ফিটে তিনি আক্রান্ত হলেন অনেক বার। যতক্ষণ জ্ঞান থাকতো অর্ধোন্মাদের মত ভয়ংকর হয়ে উঠতেন।

তীব্র জীঘাংসায় একদিন ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিলেন সদাশিববাবুর দেহ। অকস্মাৎ হিংস্র হয়ে উঠে একদিন দুই হাতে চেপে ধরেছিলেন লাবণ্যর কণ্ঠনালী। বহুকষ্টে দৈহিক বলপ্রয়োগ করে তবে সদাশিববাবু লাবণ্যকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন তাঁর কবল থেকে।

ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে দুই হাতের আঙুলগুলোকে উর্ধ্বে প্রসারিত করে হঠাৎ তীব্র চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েই আবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন।

সেই হতেই পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে তিনি একেবারেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

সেই চিঠি থেকেই সাগর জানতে পেরেছিলো আরো একটি দুঃসংবাদ।

বেলা বাগান থেকে চলে আসবার পরদিন সকালে মিসেস্ মুখার্জিকে চামচেয় করে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে সদাশিববাবু সুযোগমত এক সময় বলেছিলেন, জানো শীলা, কাল রাতে সাগর এসেছিলো আমাদের বাসায়।

একটা অর্থহীন দৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়ে ছিলেন মিসেস্ মুখার্জি। যেন কিছুই বুঝতে পারেন নি।

আবার বলেছিলেন সদাশিববাবু, তুমি বুঝতে পারছ না? কাল সন্ধ্যায় সাগরকে ধরে এনেছিলাম। সাগরকে—

সহসা যেন একটা তীব্র যন্ত্রণায় বেঁকে বেঁকে উঠতে লাগলো মিসেস্ মুখার্জির রোগজীর্ণ দেহ-কংকালটা।

অক্ষম-দেহ একটা সরীসৃপ যেন তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলো।

দুটি নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হতে লাগলো।

বিঘূর্ণিত হতে লাগলো দুটি ভাবলেশহীন অক্ষিগোলক।

এক সময়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, না—না—না—

পরমুহূর্তেই তাঁর শিথিল দেহটা শয্যার উপরে এলিয়ে পড়লো।

আবার তিনি জ্ঞান হারালেন।

সদাশিববাবু লিখেছিলেন : তোমাকে উনি আর একটুও সহ্য করতে পারছেন না। ওর যে মন একদিন দুর্বার গতিতে তোমার দিকেই ছুটে গিয়েছিলো, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেই মনই আজ তোমার প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়েছে। ওর এই মানসিক অবস্থায় কিছুতেই আর ওকে তোমাদের মধ্যে রাখা চলে না। তাই আমি স্থির করেছি, তোমাদের বিয়ে হয়ে গেলেই ওকে নিয়ে আমি অনেক দূরে চলে যাবো। তোমরা এতে দুঃখ পাবে তা আমি জানি। কিন্তু কি জানো, পৃথিবী বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর। কারো সুখ-দুঃখের দিকে তাকিয়ে সে তো চলে না। তার রথচক্র দুর্বার—দুর্দম। সেই রথের চাকার তলে আমরা পিষ্ট হয়েছি। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।

নিজের ঘরে বসে চিঠিখানি পড়তে পড়তে দুই করজোড় উর্ধ্বে তুলে সাগর বার বার প্রণাম জানিয়েছিলো একটি মহাপ্রাণ মানুষের উদ্দেশ্যে। যে মানুষটি প্রেমে আত্মহারা, সেবায় ত্যাগব্রতী, কর্তব্যে কঠিনপ্রাণ।

চিঠি পড়তে পড়তে আরো একটি মানুষের জন্য তার মন প্রেমে, প্রীতিতে ও সহানুভূতিতে বার বার সিক্ত হয়ে উঠছিলো। সে মানুষটি লাবণ্য।

লাবণ্য তার জন্য আজো অপেক্ষা করে আছে, এই আনন্দেই সাগরের দীর্ঘ দিনের বুভূক্ষু মন যেন দুই হাত তুলে নাচতে শুরু করে দিলো।

পরদিন দুপুরের রোদ পড়বার আগেই সে রওনা হলো বেলা বাগানের উদ্দেশ্যে।

সদাশিববাবুকে নিজের কথা জানাবার আগে লাবণ্যর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। তার নিজের মুখ থেকেই শুনতে হবে তার মনের কথা। কানে কানে বলতে হবে নিজের মনের কথা :

'পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—তুমি আছ, আমি আছি।'

পাখির পাখায় পা রেখে সাগর হাজির হলো বেলা বাগানের বাসায়।

বাইরের ঘরটা খালি।

সদাশিববাবু একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন। ডাক্তার-বাড়ি হয়ে বেড়াতে যাবেন।

লঘু পায়ে সাগর ঢুকলো পাশের ঘরে।

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো লাবণ্য।

সাগর ডাকলো নিম্ন স্বরে, বন্যা।

চমকে ফিরে দাঁড়ালো লাবণ্য।

দুটি চোখ অশ্রু-ছলছল।

ধ্বক্ করে উঠলো সাগরের বুকের ভিতরটা।

লাবণ্য ম্লান গলায় বললো, তুমি বাইরের ঘরে একটু বসো। আমি এখুনি আসছি।

ভারী পায়ে বাইরের ঘরে যেয়ে বসলো সাগর।

একটু পরেই ঘরে ঢুকলো লাবণ্য।

এরি মধ্যে অনেকটা যেন সংযত হয়েছে সে।

ধীর কণ্ঠে বললো, বাবা আমাকে সবই বলেছেন। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

—কিন্তু বন্যা—

চাপা গলায় লাবণ্য বললো, আস্তে কথা বলো। পাশের ঘরেই মা রয়েছেন। তুমি তো সবই জেনেছ বাবার চিঠিতে।

সাগরের পায়ের নিচ থেকে সরে সরে যাচ্ছে পৃথিবীর মাটি। বুকের ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে বুঝি।

এও কি সম্ভব?

লাবণ্য তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে?

কি যেন বলতে যাচ্ছিলো সাগর। বাধা দিলো লাবণ্য। ধীর নিচু গলায় বললো, জানি, অনেক কথা তোমার বলবার আছে। কিন্তু আমার আজ আর বলবার কিছুই নেই। তবু যদি পারো কাল দুপুরে একবার এসো। তখন কথা হবে।

পরদিন সাগর যথাসময়েই বেলা বাগানে গিয়েছিলো।

সদাশিববাবু তখন বাড়িতেই ছিলেন। নির্বাক হয়ে তিনি শুধু চেয়ে ছিলেন সাগরের দিকে। সাগরও কোন কথাই বলতে পারে নি।

লাবণ্য বাইরের ঘরে এসে 'এসো' বলে ডাকতেই তার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিলো সামনের মাঠের ধারে।

খানিক দূরে একটা নির্জন ঘরের ছায়ায় ওরা বসেছিলো দুজন।

সাগর বললো, আমার প্রতি তোমার রাগ কি আজো গেলো না বন্যা? অথচ শান্ত মনে ভেবে দেখ—

বাধা দিলো লাবণ্য, ভেবে আমি অনেক দেখেছি, আর ভাবতে পারি না।

—তাহলে কেন তুমি এমন নিষ্ঠুর হচ্ছ ?

—নিষ্ঠুর! মুখ তুলে তাকালো লাবণ্য। দগ্ধ দীর্ণ অন্তরের ভাষা প্রকাশিত হলো দৃঢ় কণ্ঠে, আজ তুমি আমাকে বলছ নিষ্ঠুর। কিন্তু যে দিন দুই অঞ্জলি ভরে জীবনের সুধারস আকণ্ঠ পান করবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলো আমার অনুরাগে রাঙা মন সেদিন তুমি কি সেই আতুর মনের দিকে একবারও চেয়ে দেখেছিলে ? সেদিন শুধু নিজের কথাই তুমি ভেবেছিলে। নিজের মনে তোমার বিতৃষ্ণা জেগেছিলো, তাই মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলে। আমার এত সাধ, এত স্বপ্ন, তার কথা কি একবারও তোমার মনে পড়েছিলো ?

—কিন্তু আমার সে দিনের মনের অবস্থা তুমি ভেবে দেখো।

—আর আমার সে দিনের মনের অবস্থা ? সেদিন যে বার বার মাটিতে মাথা কুটে আমি শুধু এই একটি মাত্র প্রশ্নেরই কোন জবাব পাই নি যে, আমার বাবা, আমার মা, সেই বাড়িঘর এ সব তোমার কাছে যদি একান্তই পরিত্যাজ্য হয়েছিলো, তাহলেও সে কথা তুমি আমাকে বললে না কেন ? কেন আমাকেও তোমার সঙ্গী করে নিলে না ? কেন সেদিন একথা তুমি ভাবতে পারলে না যে সেদিন আমার কাছে তোমার চেয়ে বড় আর কিছুই ছিলো না ?

এ তীক্ষ্ণ অভিযোগের কোন জবাবই দিতে পারলো না সাগর। শুধু বললো, মুহূর্তের উত্তেজনায় সেদিন যে ভুল আমি করেছিলাম তার জন্য তুমি কি আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারো না ?

অভিমানে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিলো লাবণ্য, ক্ষমার প্রলেপ দিয়ে জীবনের ক্ষতকে সারানো যায় না। তাছাড়া আমার জীবনের পথ আমি বেছে নিয়েছি। তার থেকে আর আমি সরতে পারব না। বাবাকেও সে কথা আমি বলেছি কাল রাতে।

অবরুদ্ধ গলায় সাগর বললো, কি তোমার জীবনের পথ ?

—আমার জীবনের পথ ? একলা চলার পথ। তুমি তো

দেখেছ, আমার মা পঙ্গু। বাবাকে ছাড়া তাঁর এক মুহূর্ত চলে না। অথচ এই দুর্ঘটনার একদিন আগে পর্যন্তও আমাকে না হলে বাবার চলতো না। তাই তাঁদের ছেড়ে আজ আমার স্বর্গে যাবারও উপায় নেই।

সাগর কোন কথা বললো না। বোবা একটা যন্ত্রণা তার ভিতরটাকে যেন সাঁড়াশির মত চেপে ধরেছিলো। কোন রকমে সেটাকে ভিতরেই চেপে রেখে সে চুপ করে বসে রইলো।

তার এই নিস্তব্ধতায় বুঝি অস্বস্তি বোধ করলো লাবণ্য। বললো, তুমিই বলো, দুটি অসহায় মানুষ অনাত্মীয় পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বেড়াবে মৃত্যুকাল পর্যন্ত, আর আমি বিয়ে করে সুখের নীড় গড়ব, তাই কি আমি পারি? না পারা উচিত?

এ-প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আর্তকণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করলো সাগর, কিন্তু আমি এখন কী করব বলে দাও?

সাগরের হাহাকারে মুহূর্তের জন্য বুঝি কেঁদে উঠলো লাবণ্যর মন। নরম গলায় বললো, দেখো, প্রত্যেকের জীবন একান্ত ভাবেই তার নিজের। তাকে চালাবার দায়িত্বও তাই নিজেকেই নিতে হয়। কারো জীবনের পথ অন্যে দেখিয়ে দিতে পারে না। দেওয়া উচিতও নয়। তুমি তো বুঝতেই পারছ, তোমার আমার মাঝখানে আজ দাঁড়িয়ে আছেন আমার পঙ্গু শয্যাশায়ী মা আর তাঁর সেবায় আত্মনিবেদিত আমার বাবা। তাঁদের অতিক্রম করে তোমার কাছে যাওয়া আজ আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

একটা নতুন আশার আলো বুঝি জ্বলে উঠলো সাগরের মনে। সাগ্রহে সে বললো, যদি অভয় দাও তো একটা কথা বলি।

—বলো।

—তোমার আমার মাঝখানের এই বাধা যেদিন আর থাকবে না সেদিনের জন্য কি আমি তবে অপেক্ষা করে থাকব?

—অপেক্ষা করে থাকবে? বিস্ময় ঝরে পড়লো লাবণ্যর গলায়।

—হ্যাঁ বন্ধা, তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করেই থাকব।

সুধা-সমুদ্রের একটা ক্ষীণধারা কি তাহলে এখনো অবশিষ্ট আছে?

মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠলো লাবণ্যর মন।

কিন্তু না, আর তা সম্ভব নয়। লাবণ্যর অভিমানবিক্ষত মন আবার কঠিন হয়ে উঠলো।

দৃঢ় কণ্ঠে সে বলে উঠলো, না না, কাউকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। আমি কারো জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে পারব না।

বলতে বলতে অশ্রুর বন্যা এসে ছাপিয়ে দিলো তার কণ্ঠস্বর।

চকিতে উঠে দাঁড়ালো সে।

—আমি যাই। বলেই স্খলিত পদে লাবণ্য বাড়ির পথে দ্রুত পা ফেললো।

অধীর আগ্রহে তাকে ডাকলো সাগর, লাবণ্য শোনো—শোনো—

লাবণ্যর বুকের ভিতর তখন ঝড়ের হাওয়া।

সে-ডাক তার কানে গেলো না।

দুই হাতে চোখে আঁচল চেপে ছুটতে লাগলো।

সেই দিকে চেয়ে সাগর তড়িতাহতের মত নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

॥ ১৪ ॥

একটানা অনেক ক্ষণ কথা বলে সাগর চুপ করলো।

আমিও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম ওর মুখের দিকে।

দেখলাম, দুঃখ-কষ্টের তীব্রতাকে অতিক্রম করে ও যেন অনেকটা আত্মস্থ হয়ে উঠেছে।

বুঝলাম, জীবনের যুদ্ধে বার বার মার খেয়ে জীবনের হার-জিতের পালাকে ও এখন সহজ ভাবে গ্রহণ করতে শিখেছে।

অথবা বুঝি বা ওর জীবনের সমুদ্রই আজ শুকিয়ে গেছে। সেখানে শুধু ধূ ধূ করছে নীরস বিশুষ্ক বালু-বেলা।

তাই সুখ-দুঃখ, ব্যথা-আনন্দ, জয়-পরাজয়—কিছুতেই আর আজ ওর মনের সাগরে ঢেউ জাগে না।

সব কিছুকেই একান্ত নিরাসক্ত মনে গ্রহণ করতে ও শিখেছে।

ওর জীবনই ওকে শিখিয়েছে : সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্।

প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা সাগর, লাবণ্যর সঙ্গে তোমার আর কখনো দেখা হয় নি?

—হয়েছিলো। শোনো তাহলে।

বুকের মধ্যে একটা শূন্যতার হাহাকার নিয়ে সেদিন আস্তানায় ফিরে গেলাম।

সারা রাত ঘুমুতে পারলাম না।

পরদিন সকালেই জরুরী কাজের অছিলায় কলকাতা চলে গেলাম। পাছে লাবণ্যদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায়।

দেখা কিন্তু করতেই হলো।

কলকাতা ফিরে তিন দিনের দিন মিঃ মুখার্জির টেলিগ্রাম পেলাম: শীঘ্র দেখা করো

তবে কি লাবণ্য মত পাল্টেছে?

সে কি ক্ষমা করেছে আমাকে?

হায়রে দুরাশা!

বৈদ্যনাথধাম স্টেশনে নেমে সোজা চলে গেলাম বেলা বাগানে।

বাইরের বারান্দায় দুই হাতের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে বসে ছিলেন মিঃ মুখার্জি।

কাছে যেয়ে বললাম, আমি এসেছি।

মাথা তুললেন তিনি।

নত হয়ে পায়ে হাত দিতে যেতেই তিনি বাধা দিলেন।

বললেন, থাক। প্রণাম করো না।

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলাম তাঁর মুখের দিকে।

মাত্র কয়েক দিনে এ কী চেহারা হয়েছে তাঁর! দুটি চোখের নিচে বুঝি অনেক অশ্রুধারার অস্পষ্ট দাগ।

প্রশ্ন করলাম, কী হয়েছে আপনার?

—আমার কিছুই হয় নি। তোমার মাসিমা মারা গেছেন।

—সে কি? কবে?

—শশ্মান থেকে ফিরেই তোমাকে টেলিগ্রাম করেছি। সেই দিন সকালেই তিনি চলে গেলেন।

—কি হয়েছিলো হঠাৎ?

—হঠাৎ তো নয় বাবা। অনেক দিন থেকেই তো তিনি পা বাড়িয়ে ছিলেন।

অভিভূতের মত আমি সেখানেই বসে পড়লাম। কোন কথাই আর বলতে পারলাম না।

মিঃ মুখার্জিও আর কোন কথা বললেন না।

স্নান সেরে আহারাদি করলাম।

লাবণ্যকেও দেখলাম। তেমনি গম্ভীর। তেমনি ম্লান।

নতুন সূর্যোদয়ের এতটুকু রাগরেখাও তো পড়ে নি তার মুখে।

তা হলে?

আমি যে অনেক আশা নিয়ে এসেছি। তার কি হবে?

আমার শেষ আশার সমাধি হতেও সময় লাগলো না।

দুপুরের পরেই মিঃ মুখার্জি আমাকে বললেন, কেন তিনি আমাকে ডেকেছেন।

বললেন, আমার শেষ বন্ধন এবারে ছিঁড়ে গেলো। লাবণ্য আর আমার বন্ধন নয়। নিজের পায়ে ও দাঁড়াতে শিখেছে। এবার তাই আমার ছুটি।

মুখ তুলে তাকালাম।

শান্ত গম্ভীর মুখ।

—কিন্তু ছুটি নেবার আগে আমার শেষ কাজটি আমি শেষ করে যেতে চাই। আমার সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থের কিছু এখনো অবশিষ্ট আছে। তুমি আর লাবণ্য দুইই আমার সন্তান। তাই সেই অর্থ আমি তোমাদের দুজনকে সমান ভাবে দিয়ে আমার আশীর্বাদ জানিয়ে যেতে চাই।

বললাম, কিন্তু আপনার বাকি জীবন তাহলে চলবে কিসে?

—আমার জন্যে আর আমি ভাবি না বাবা। সারাটা জীবন নিজের অহংকারে অনেক কিছুই তো করলাম। কিন্তু তাতে কি ফল হলো? সব ছেড়েছুড়ে এবার তাই সেই একজনের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিতে চাই। দেখি তাতেই বা কি হয়।

এরপর আর কোন কথা চলে না।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, আপনার আশীর্বাদই আমার জীবনের অক্ষয় পাথেয় হয়ে থাক। কিন্তু আপনার টাকা আমি নিতে পারব না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

—কিন্তু কেন নিতে পারবে না ?

—আপনার স্নেহের অংশীদারই আমি হতে চেয়েছি। সেই স্নেহ যে আমি দুহাত ভরে পেয়েছি এতেই মন আমার ভরে আছে। আপনার অর্থের অংশীদার হয়ে তো আসি নি পৃথিবীতে। আর সে অংশীদার হবার যোগ্যতা অর্জনও করতে পারি নি। তাই—

কথা আমি শেষ করলাম না চুপ করে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, বেশ, তোমার মন না চায় নিও না। তবে একটা কথা—

—বলুন।

—তোমার মাসিমার ব্যবহারে যদি তোমার মনে কোন ক্ষোভ থেকে থাকে, তাহলে সে ক্ষোভ তুমি মন থেকে মুছে ফেলে দিও। এটা আমার অনুরোধ সাগর।

—ছিঃ ছিঃ, অনুরোধের কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনি আমার পিতৃতুল্য। বাবার কথা আমার ভাল করে মনেই পড়ে না। আমার কাছে আপনি তাঁর চেয়েও বড়। আর ক্ষোভ ? পৃথিবীতে কারো প্রতিই আজ আর আমার কোন ক্ষোভ নেই। বোধ হয় ক্ষোভকে পুষে রাখবার মত মনই আমার নেই।

মিঃ মুখার্জি বললেন, আশীর্বাদ করি বাবা, এই নিরাসক্তিই যেন জীবনের পথে চলতে তোমাকে শক্তি দেয়।

চকিতে মনে পড়লো, প্রাণতোষবাবুও একদিন এই একই আশীর্বাদ আমাকে করেছিলেন। জানি না আজ তিনি কোথায় ?

প্রশ্ন করলাম, আপনি এখন কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন ?

চোখ বুজেই তিনি বসেছিলেন। আমার প্রশ্নে চোখ খুলে বললেন, কিছুই তো ঠিক করি নি এখনো। লাবণ্যর স্কুলের ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এলো। ও এখান থেকে চলে গেলেই যেদিকে হোক আমি বেরিয়ে পড়ব। আপাততঃ কাশী যাবারই ইচ্ছে আছে মনে। এখন তাঁর ইচ্ছে।

সেদিন বেলা বাগান থেকে স্কুলের আস্তানায় ফিরবার আগে লাবণ্যর সঙ্গেও দেখা হয়েছিলো।

শেষ দেখা। ভবিষ্যতের সব আশা নির্মূল করে সব স্বপ্নের সমাধি করে আসা সেই দেখা।

আমার দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইলো লাবণ্য। কোন কথা বললো না। আমিই বললাম, আজও কি তোমার-আমার মাঝখানের ব্যবধান দূর হয় নি?

লাবণ্য জবাবে বললো, ও-প্রশ্ন তুমি আমাকে করো না। জবাব আমি দিতে পারব না।

বললাম, আমার সম্বন্ধে তুমি কি ভেবেছ তা তুমিই জানো। তবু যাবার আগে একটা কথা তোমাকে বলে যাব। তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করেই থাকব। যদি কখনো তোমার সময় আসে, সেদিন যেন আমাকে ডাকতে ভুলো না।

লাবণ্য কোন কথা বললো না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো কি না বুঝতে পারলাম না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

লাবণ্য বললো, তুমি যাচ্ছ?

—যেতে তো হবেই।

হঠাৎ যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো লাবণ্য। এক পা এগিয়ে এসে বললো, এখন প্রণাম করতে নেই। তবু যাবার আগে তুমি আমাকে আশীর্বাদ করে যাও, জীবনের সত্য পথ থেকে যেন কখনো বিচ্যুত না হই। ভুলেও যেন এমন কিছু না করি যাতে তোমার মাথা হেঁট হতে পারে।

লাবণ্য নিজের কথা ভাবে নি, আমার মাথা হেঁট হবার কথাই ভেবেছে, অনেক দুঃখের মধ্যেও সেই সান্ত্বনাটুকু নিয়েই সে দিন বেরিয়ে এসেছিলাম বেলা বাগানের বাসা থেকে।

লাবণ্যর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

॥ ১৫ ॥

কিন্তু—

'শেষ নাই যে। শেষ কথাটি কে বলবে।'

কে বলতে পারে যে তোমার-আমার এই শেষ দেখা ?

সাগরই কি সেদিন জানত যে লাবণ্যর সঙ্গে আবার তার দেখা হবে ?

অনেক—অনেক দেখা।

দুই চোখ ভরে দেখা।

দেখা আর বলা : জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।

আর আমিই কি সেদিন জানতাম যে সাগরের সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে ?

দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে সে রাতটা আমার বাসায়ই কাটিয়ে পরদিন ভোরে সকলের অলক্ষ্যে যেদিন সে চলে গিয়েছিলো সেদিন কি আমিই ভাবতে পেরেছিলাম যে এমন ভয়ানক অবস্থায় আবার তার সঙ্গে আমার দেখা হবে ?

অথচ দেখা তো হলোই।

কী সে দৃশ্য। না দেখলেই তো ছিলো ভাল।

আমার গতানুগতিক সাদা জীবনের পাতায় কেন এই রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন ?

অনেক রাতে সিনেমা দেখে ফিরেছি। সকালে একটু দেরিতেই ঘুম ভেঙেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি, রাস্তার উঁচু রকে হাঁটু ভেঙে বসে আছে সাগর।

পথচারী ভিক্ষুকের বেশ। জীর্ণ মলিন রুগ্ন চেহারা। চোখের নিচে কালি পড়েছে। আসন্ন মৃত্যুর বীভৎস ছায়া পড়েছে সর্ব শরীরে।

রকের নিচে এবং উপরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্তূপ স্তূপ কাসি। তামাটে রং। হৃদপিণ্ড নিঙড়ানো বিবর্ণ রক্তপিণ্ড সব।

শিউরে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, সাগর কখন এসেছ? এ কী চেহারা হয়েছে তোমার?

আমাকে দেখেই একটা পাণ্ডুর হাসি খেলে গেলো সাগরের মুখে। বললো, কাল রাতে এসেছি ভাই।

বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কোথায় ছিলে সারা রাত?

তেমনি ম্লান হেসেই সাগর জবাব দিলো, এই রকটাতেই শুয়ে-ছিলাম। তোমাকে ডাকলাম। কড়াও নাড়লাম। এক বুড়ো ভদ্রলোক—বোধ হয় তোমাদের বাড়িওলা—বললেন, তোমরা সিনেমায় গিয়েছ। অগত্যা এখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

আশ্চর্য! কাল রাতে সিনেমা থেকে ফিরে ওর পাশ দিয়েই তো ঘরে ঢুকেছি। অথচ খোলা রকে শুয়ে সারাটা রাত ও কাটিয়েছে। অসুস্থ শরীর। গায়ে একটা গরম কাপড় নেই। ছেঁড়া হাফসার্ট সম্বল।

বললাম, কিন্তু তোমার এ অবস্থা কেন?

সাগর তিক্ত করুণ কণ্ঠে বলল, কি করি বলো? পকেটে পয়সা নেই। একটা কাণাকড়ি উপার্জন নেই।...

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে সাগর হাঁফিয়ে পড়লো।

খক খক করে খানিক কেসে থুথু ফেললো রাস্তায়।

বিবর্ণ রক্তাভ কাসি। জীবনের দূষিত অপচয়। মৃত্যুর নির্মম চরম পত্র।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিব্রত হয়ে সাগর বললো, আমি যে বড়ই আশা করে এসেছি তরুণ, তোমার এখানেই আপাতত কয়েকটা দিন থাকবো, তারপরে—

তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম, কিন্তু সে তো সম্ভব হবে না সাগর। একে আমার এই ছোট বাসা। তার উপর তুমি অসুস্থ। এ অবস্থায় এখানে তোমার থাকবার ব্যবস্থা কি করে হবে বলো তো?

সাগর মাথা নিচু করলো।

একটা উদ্ধত কাসির চাপ কোন রকমে সহ্য করলো। কোন কথা বলতে পারলো না।

আমি বললাম, দু' চার বেলা খাওয়াটা অবশ্যি প্রশ্ন নয়। দুটি ডাল-ভাতের ব্যবস্থা কোন মতে করাই যাবে। কিন্তু সেটা তো আসল কথা নয়। এভাবে তুমি কদিনই বা থাকবে। আর এতে তোমার লাভই বা কি হবে।

সাগর উৎসাহের সঙ্গে বললো, সে-ব্যবস্থা আমি মনে মনে ঠাউরে নিয়েই তোমার কাছে এসেছি। ঠিক করেছি, খবরের কাগজ ফেরি করব। তাতে বেশ দু'পয়সা লাভও হবে। আর কাজটাও আমার খুব পছন্দ। স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করব। কারো তোয়াক্কা রাখব না।

চারদিকের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাসির স্তূপগুলোর দিকে চাইলাম।

ওর অতি উৎসাহভরা কথাগুলি মোটেই ভালো লাগলো না।

বাধা দিলাম, তা তো হবে না সাগর। যা তোমার শরীর। এমনিতেই তো অচল। তারপর খবরের কাগজ ফেরি করার হাড়ভাঙা খাটুনি তো তোমার সইবে না।

সাগর চিরকালের বেপরোয়া সুরে জবাব দিলো, শরীরের দিকে অতো নজর দিলে গরীবের জীবন চলে না। খাটনির চাপ পড়লেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। ও সব ভাবনা তুমি রাখো। যে জন্যে তোমার কাছে এসেছি তাই করো। তোমাদের 'যুগবার্তা' কাগজের আপিসে আমি কাল বিকেলে গিয়েছিলাম। সেখানেই তো তোমার নতুন

ঠিকানা পেলাম। শুনলাম তোমার নাইট ডিউটি। একটু দমে গেলাম। তবুও সাহস করে ঢুকলাম ম্যানেজারের ঘরে। তিনি বললেন, টাকা এ্যাডভান্স না করলে কাগজ পাওয়া যাবে না। তাই তো সারা রাত তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। তুমি ভাই কাগজটার একটা ব্যবস্থা করে দাও। আমি বেচে টাকা দেব।

আবারও খক্ খক্ করে খানিক কেসে থুথু ফেললো সাগর।

তীব্রকণ্ঠে ওর প্রস্তাবে বাধা দিলাম, না, না, তা হবে না। খবরের কাগজ ফেরি করতে গেলে তুমি তিন দিনও বাঁচবে না। তোমাকে নিজের হাতে আমি মেরে ফেলতে পারব না। না—না।

অসহায়ভাবে সাগর বললো, তাহলে আমি কি করবো ?

—কী যে করবে সেইটেই তো সমস্যা।

খানিক চুপ করে থেকে বললাম, আচ্ছা, তুমি একটু বসো এখানে। আমি এখুনি আসছি।

ভিতরে যেয়ে মিনতিকে বললাম সাগরের কথা।

বিবাহিত জীবনের প্রথম উচ্ছ্বাসের মাথায় কৈশোর ও যৌবনের অন্য অনেক কাহিনীর সঙ্গে সাগরের অসাধারণ প্রতিভা ও তার শোচনীয় পরিনামের কাহিনীও ফলাও করে বলেছিলাম মিনতিকে।

সেই থেকেই সাগর মিনতির মনে একটি 'রোম্যান্টিক হিরো'র আসন দখল করে বসেছিলো।

সেই 'হিরো' আজ একেবারে তার দোরগোড়ায় এসে হাজির। কথাটা শুনেই মিনতি যেন একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

—ওমা! বন্ধুকে তুমি বাইরের রকে বসিয়ে রেখে এসেছ ? করেছ কি ? তাকে ভিতরে নিয়ে এসো।

বললাম, আস্তে মিনু, আস্তে। ও শুনতে পাবে।

তারপর চুপি চুপি বললাম ওর মারাত্মক অসুখের খবর।

শুনে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলো মিনতি।

বুঝি বা স্বপ্নভঙ্গ হলো।

কিন্তু পরমুহূর্তেই সে বললো, তাই বলে এমন বিপদে পড়ে বন্ধু এসেছে বন্ধুর কাছে, তাকে তো তুমি ফিরিয়ে দিতে পারো না এ অবস্থায়।

—তা হয় তো পারি না। কিন্তু এখানে তাকে রাখি কোথায়? আমাদের এই পাখির বাসায় তো তাকে রাখা চলে না।

—তা অবশ্যি চলে না।

কি যেন একটু ভাবলো মিনতি। কিসের আশা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো তার চোখে। বললো, আচ্ছা, তোমরা তো খবরের কাগজের লোক। তোমরা চেষ্টা করলে সব পারো। তোমাদের আপিসের কর্তাদের কাউকে ধরে বন্ধুকে হাসপাতালে ভর্তির একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারো না?

কথাটা মনে লাগলো। নিঃসম্বল সাগরের পক্ষে কোন টি. বি. হাসপাতালে ভর্তি হওয়া খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তবু আপিসের কর্তারা কেউ দয়া করে চেষ্টা করলে হয় তো একটা সিট জুটে যেতেও পারে।

বললাম, ঠিক বলেছ তুমি। সেই চেষ্টাই করে দেখি। আমি তাহলে এখুনি একটু বেরুচ্ছি। সাগরের যত্ন-আত্তির ভার তোমার উপর রইলো।

মিনতি খুশি-খুশি গলায় বললো, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বন্ধুর কোন অযত্ন হবে না। তুমি যাও।

সাগরকে মিনতির হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি হাসপাতালের সন্ধানে বের হলাম। যাবার আগে মিনতিকে আড়ালে ডেকে বললাম, তোমার হাতে বন্ধুর অযত্ন হবে না তা জানি। কিন্তু যত্নের বাড়াবাড়ি যেন করো না আবার। রোগটা রাজরোগ সেটা ভুলে যেও না।

ফিরে এলাম সুখবর নিয়ে।

কর্তার একটি ফোনেই কাজ হয়েছে।

সাগরেরও কপাল ভাল বলতে হবে। একটি সিটই খালি ছিলো। সেই দিনই সাগরকে ভর্তি করে দিতে হবে।

বেশ একটা আত্মপ্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরেই দেখি, মিনতি এরই মধ্যে সাগরের হাল একেবারে ফিরিয়ে ফেলেছে। নাপিত দিয়ে দাড়ি কামিয়েছে। স্নান করিয়ে ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরিয়েছে। পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করিয়েছে। দেহে ও মনে সাগর যেন একটি নতুন মানুষ হয়ে বসে আছে।

হাসপাতালে সিট পাওয়া গেছে শুনে ওর পাণ্ডুর মুখখানাও যেন খুশির হাসিতে ঝিলমিলিয়ে উঠলো। গভীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা তরুণ, সময় মত চিকিৎসা হলে টি. বি. রোগী তো আজকাল অনেক সময়ই সুস্থ হয়ে যায়, কি বলো?

গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললাম, নিশ্চয়। আমরা রয়েছি। দেখাশুনা করব। তুমি নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠবে।

কৃতজ্ঞতায় ছল ছল করে উঠলো সাগরের দুটি কোটরগত চোখ। বললো, যদি বাঁচি তো তোমাদের কৃপায়ই বাঁচব তরুণ। বিশেষ করে বৌদির আদর-যত্নে। সত্যি, তুমি ভাগ্যবান তরুণ। এমন স্ত্রী মানুষ অনেক ভাগ্যে পায়।

কথাটা অনেক ক্ষণ থেকেই বলব-বলব ভাবছিলাম। এবার সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা সাগর, এর মধ্যে লাবণ্যর সঙ্গে তোমার আর কখনো দেখা হয়েছে? কিম্বা সদাশিববাবুর সঙ্গে?

মাথা নিচু করে চুপ করে রইলো সাগর। আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না। একটু পরে বললো, না ভাই, ওদের কারো সঙ্গেই আর আমার দেখা হয় নি। মিঃ মুখার্জি আজ তীর্থপথের নিরাসক্ত পথিক। তাঁর সঙ্গে আর কোন দিন দেখা হবে সে আশাই নেই। আর লাবণ্য? কী হবে মিথ্যে আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে?

আবার চুপ করলো সাগর।

কী যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

তারপর বললো, জানো তরুণ, এই রোগ ধরা পড়বার ফলে একদিন স্কুল থেকে চাকরি গেলো। হাতে যৎসামান্য সম্বল যা ছিলো তাই দিয়ে কিছু কিছু চিকিৎসা করালাম প্রথম দিকে। কোনই ফল হলো না। তারপর থেকেই এই রকম ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াই। প্রতিজ্ঞা করেই বেরিয়েছিলাম, পূর্বপরিচয়ের সুযোগ নিয়ে কাউকে আর বিরক্ত করব না। করিও নি এত দিন। এক এক সময় ভারী ভয় করত। এমনি করে পথে ঘাটে পড়ে মরে যাব শেষ পর্যন্ত। কেউ এক ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেলবে না। বার বার তখন দুখানি মুখই চোখের সামনে ভেসে উঠত। একখানি তোমার, আর একখানি লাবণ্যর। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে দুর্বলতা আমি জয় করতে পেরেছি। শুধু এত দিনে তোমার কাছেই আমার পরাজয় হলো তরুণ। তোমার কাছে না এসে আমি পারলাম না।

হেসে বললাম, দুর পাগল, বন্ধুর কাছে আবার জয়-পরাজয় কি? এখানে এসে তুমি খুবই ভাল করেছ। আচ্ছা, তুমি বিশ্রাম করো এখন। খেয়েদেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

॥ ১৬ ॥

সাগরকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে বেশ খুশি মনেই বাড়ি ফিরে এলাম।

অসহায় অসুস্থ বন্ধুর একটা পরম উপকার করতে পেরেছি, এইটেই আমার খুশির কারণ। আরো দু'বার সহায়সম্বলহীন অবস্থায় সাগর আমার কাছে এসেছে। কিন্তু তখন আমারও কিছু করবার ছিলো না, আর সেও আমার কাছ থেকে কোন সহায়তা নিতে ঠিক রাজী ছিলো না।

এবারে এমন একটা ভয়ংকর সংকটে সে আমার উপরেই একান্ত ভাবে নির্ভর করেছে। আর তার সে নির্ভরতার যোগ্য মূল্য আমি দিতে পেরেছি। বন্ধুকৃত্য সম্পাদনের এই আনন্দেই আমি মশগুল।

খুশি হয়েছে মিনতিও খুব।

প্রায়ই দুজনে মিলে যাদবপুর হাসপাতালে যাই।

ট্রেনটা ভিজিটিং আওয়ারের একটু আগে পৌঁছে স্টেশনে। হাসপাতালের ভিতরকার পুকুরপারের ইউক্যালিপ্‌টাস গাছটার তলায় ঘাসের বুকে দুজন বসে থাকি। সাগরের অতীত জীবনের জাবর কাটি।

মিনতির কল্পনাপাগল চোখ দুটো কখনো আনন্দে, কখনো নৈরাশ্যে জ্বল্ জ্বল্ করে।

এক সময় দুজনে হাত ধরাধরি করে সাগরের বেডে যাই। মিনতি নিজের হাতে তাকে ফল ছাড়িয়ে খাওয়ায়। কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কখনো বা একটু হাসি-তামাসাও করে।

সাগরও সানন্দে তাতে যোগ দেয়। মাঝে মাঝে সরস মন্তব্যও করে দু'একটা।

একদিন আমাকে একলা পেয়ে সাগর বললো, তুমি ভাগ্যবান তরুণ। আর তোমার ভাগ্যে আমিও ভাগ্যবান যে এই দুর্দিনে বৌদির হাতে এসে পড়েছিলাম। নইলে এতদিন কোন্ ভাগাড়ে পড়ে ধুকতাম তা কে জানে।

হেসে বললাম, এখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমাদের ছোট্ট বাসায় তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পার তবে তো বুঝি আমার ভাগ্যের জোর।

—তা যা বলেছ। তবে ডাক্তারবাবুরা তো খুবই ভরসা দিচ্ছেন। এখন দেখা যাক।

—না না, শুধু ভরসার কথা নয়। সত্যি তুমি অনেক ইম্‌প্রুভ করেছ আগের থেকে।

দুটি চোখে অসীম ব্যগ্রতা নিয়ে সাগর বললো, সত্যি বলছ আমি অনেক ইম্‌প্রুভ করেছি?

জীবনের প্রতি এমন উগ্র মমতা, বেঁচে থাকবার জন্য এমন তীব্র আকুলতা এর আগে আমি সাগরের মধ্যে দেখি নি কোন দিন।

অভিমানী সাগর কখনো বিপদে পড়ে—তা সে যত বড় বিপদই হোক—কোন প্রিয়জনের আশ্রয় ভিক্ষা করবে, এবারকার ঘটনার আগে তা যেন আমি কল্পনাও করতে পারতাম না।

তাই তো ইদানীং সবিস্ময়ে মাঝে মাঝে ভাবি, জীবন বড় নির্মম প্রভু। লাইফ ইজ এ হার্ড টাস্ক-মাস্টার। তার তাড়নায় সব—সবই বুঝি সম্ভব।

আবার মাঝে মাঝে ভয়ও হয়।

শুনেছি কঠিন রোগীর পক্ষে বেঁচে থাকবার অতিরিক্ত কামনা সুলক্ষণ নয়।

তবে কি ?

সঙ্গে সঙ্গেই মনকে সান্ত্বনা দেই। না না, সাগরের সম্পর্কে আমার এ আতঙ্ক একান্তই অমূলক। সে তো ধীরে ধীরে ভালর দিকেই চলেছে।

তবু ইদানীং একটা দুশ্চিন্তার কারণ দেখা দিয়েছে।

হাসপাতালে ফ্রী বেড হলেও কিছু কিছু ওষুধপত্র মাঝে মাঝেই আমাকে জোগান দিতে হয়। আর আমার মত স্বল্প আয়ের লোকের পক্ষে সে খরচটা নিয়মিত বহন করাও সম্ভব নয়।

অথচ এ অবস্থায় করিই বা কি ? সাগরের আত্মীয়-বন্ধু এমন আর কে আছে যার কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাততে পারি ?

স্মৃতির পাতা অনেক হাতড়ে বেড়ালাম।

প্রাণতোষবাবু আজ নিরুদ্দিষ্ট। বেঁচেই আছেন কি না কে জানে।

সদাশিববাবুর অবস্থাও তথৈবচ।

লাবণ্য ?

লাবণ্য তো শিক্ষকতা করে। যাই হোক একটা নিয়মিত উপার্জন তার আছে। তাছাড়া সাগরের মুখেই তো শুনেছি, পৈত্রিক কিছু সঞ্চিত অর্থও সে পেয়েছে। সাগরের এই বিপদের কথা জানলে সে কি সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না ?

একদিন তো তারা পরস্পরকে ভালবেসেছিলো। হয় তো তাদের বিয়েও হতো। অভিমানবশেই হোক আর ভুল বুঝেই হোক, ঘটনার নির্মম খড়্গাঘাতে ছিন্নবন্ধন হয়ে দুজন দুদিকে ছিটকে পড়েছে বলেই কি এক জনের এতবড় দুর্দিনেও আর এক জন এগিয়ে আসবে না সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ? তাও কি কখনো সম্ভব ?

খরচের টানা-পড়েনে কাহিল হয়ে একদিন তাই সরাসরিই কথাটা সাগরের কাছে পাড়ব বলে স্থির করলাম।

কথাপ্রসঙ্গে বললাম, আচ্ছা সাগর, লাবণ্য এখন কোথায় থাকে জানো ?

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে সাগর বললো, কেন বলো তো?

—না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। সে কি এখনো মাস্টারি করে?

—হ্যাঁ।

—কোন্ স্কুলে?

বর্ধমান জেলার একটা মহাকুমা শহরের নাম করলো সাগর।

একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, তোমার এমন অসুখ, লাবণ্যকে কি একটা খবর দেব?

একটু যেন ভয় পেয়েছে এমনি স্বরে সাগর বললো, কেন বলো তো? ডাক্তারবাবু কি কিছু বলেছেন? আমার অসুখ কি তাহলে খারাপের দিকে যাচ্ছে?

—আরে না না, সে সব কিছু নয়। তুমি বেশ ভালই আছ।

—তাহলে হঠাৎ লাবণ্যকে খবর দেবার কথা বলছ কেন?

সব কথা অকপটেই খুলে বললাম।

সাগর গম্ভীর হয়ে কিছু ক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, অর্থাৎ যে আমাকে শূণ্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে তার কাছেই আমাকে হাত পাততে হবে? একেই কি নিয়তির পরিহাস বলে না তরুণ?

—এটা সেন্টিমেন্টের কথা নয় সাগর, কঠোর বাস্তবের কথা। কি ভুল বোঝাবুঝি তোমাদের দুজনের মধ্যে হয়েছে তারই জের টেনে তোমরা সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবে কেন তা তো বুঝতে পারি না।

—তুমি বুঝতে পারবে না ভাই। এটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নয়। তাহলে তো একদিন ঠিক বোঝাবুঝির একটা পথ থাকত।

—কিন্তু লাবণ্য তোমাকে ভালবাসে।

—হয় তো একদিন বাসত। কিন্তু একদিন যা সত্য ছিলো আজ যে তার কাছে সেটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে গেছে।

—কি করে জানলে যে আজ সেটা মিথ্যে হয়ে গেছে?

—নইলে কি বার বার এমন নির্মম ভাবে সে আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারত? তুমিই বলো তরুণ, পারত কি?

এ অশ্রুসিক্ত প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

উত্তেজনা একটু প্রশমিত হলে সাগর বললো, আমি বলি কি তোমরা এত ঘন ঘন এখানে আসা ছেড়ে দাও। যাতায়াতে তো অনেক খরচ। আর ফলমুলও আমার জন্য কিছু এনো না। এখানে এরা যা খেতে দেয় সেই তো যথেষ্ট।

—সে কাজ করতে গেলে তোমার বৌদি আমাকে মারতে আসবেন। তাকে তো তুমি জানোই। তাছাড়া আসল সমস্যার তো তাতে সমাধান হবে না। যেমন করে হোক টাকা যে চাই-ই।

হঠাৎ বুঝি সুপ্ত অভিমান জেগে উঠলো সাগরের মনে।

কালপুরুষের ভস্মাচ্ছাদিত নক্ষত্র-দীপ্তি বুঝি মুহূর্তের জন্য ফুটে বেরুলো।

ক্ষুব্ধ গলায় সাগর বললো, হাসপাতালে একটা ফ্রি বেড জোগাড় করে দিয়ে আমার অনেক উপকার তুমি করেছ। দোহাই তোমার ভাই এর চেয়ে বেশি কিছু করবার চেষ্টা তোমরা করো না। পথে ঘাটে পড়েই যার মরবার কথা এর চেয়ে ব্যয়বহুল চিকিৎসার বিলাসিতা তার শোভা পায় না।

বুঝলাম, সাগরের মনের খুব স্পর্শকাতর তন্ত্রীতে আঘাত লেগেছে। লাবণ্যর প্রতি গভীর ভালবাসার টানে বার বার এগিয়ে যেয়েও তার অভিমানক্ষুব্ধ মনের কাছে থেকে যে আঘাত ও পেয়েছে, তাকে আজও ও ভুলতে পারে নি। তাই সহজ সুস্থ অবস্থায় তাকে কাছে পেলে ওর মনের ময়ুর যদিও বা আবারও শত বর্ণের কলাপ-বিকাশে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, তবুও এই রোগজীর্ণ অসহায় অবস্থায় টাকার জন্য কোন রকম সাহায্যের জন্যই তার কাছে হাত পাততে ওর মন কিছুতেই রাজী হচ্ছে না।

ওর শরীরের যা অবস্থা তাতে অধিক মানসিক উত্তেজনায় রোগ বেড়ে যেতে পারে এই আশংকায় আমিও আর এ নিয়ে কথা বাড়ালাম

না। বললাম, ঠিক আছে। তোমার যখন এতই আপত্তি তখন খবর তাকে দেব না।

আমার গলায়ও হয় তো একটু অভিমানের সুর লেগেছিলো।

ছলো ছলো চোখে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে সাগর বললো, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না তরুণ। তোমাকে আঘাত দেবার জন্য কথাগুলো আমি বলি নি। তুমি তো জানো, সেই দুঃস্বপ্নের রাতে যখন ও-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম সেই দিনই লাবণ্যর সঙ্গে সব সম্পর্ক আমি চুকিয়ে দিয়েছিলাম। সেদিন বুক আমার ভেঙে গিয়েছিলো। চোখের জলে পথ ঝাঁপসা হয়ে গিয়েছিলো। তবু জীবনে সেই একলা চলার পথে নেমে আসা ছাড়া আর কোন কথাই সেদিন আমি ভাবতে পারি নি। কোন দিন যে অন্য ভাবে আবার ভাবতে হবে সে আশাও মনের কোণে কোন দিন ভুলেও পোষণ করি নি। তবু ঘটনাচক্রে আবার যেদিন লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হলো তাদের বেলা বাগানের বাসায়, সেই দিনই প্রথম সবিস্ময়ে জানলাম যে আমার মনের সম্পূর্ণ অগোচরেই বুঝি একটি ক্ষুধাতুর মন শুধু তারি জন্য এত দিন নীরব প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলো। অতীতের সব সংকল্প মুহূর্তে ভুলে গেলাম। একান্ত আগ্রহে হাত বাড়িয়ে ধরলাম তারই দিকে। তারপর তুমি তো জানো সে হাত আমার শূন্য হয়েই ফিরে এলো। কোন কিছু প্রত্যাশা করবার এতটুকু ফাঁকও আর অবশিষ্ট রইলো না আমার সামনে। তুমিই বলো, এর পরেও কি তাকে নিয়ে আর টানাটানি করতে আমি পারি? না করা উচিত?

মনের আবেগে ধীরে ধীরে কথাগুলি বললো সাগর। ইচ্ছা করেই আমি বাধা দিলাম না। অবরুদ্ধ আবেগ যত বাইরে প্রকাশ পায় ওর মন ও দেহের পক্ষে ততই মঙ্গল।

হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে মিনতিকে সব কথা বললাম।

আরও বললাম, আচ্ছা মিনু, তোমার কি মনে হয় লাবণ্য সত্যি আর সাগরকে ভালবাসে না ?

মিনতি বললো, খবরের কাগজের পাতা ভরাতে ভরাতে তোমাদের মনটাও কি কাগজের মতই নিরেট হয়ে গেছে ? এই সহজ কথাটাও বুঝতে পারো না ?

—কি সহজ কথা ?

—ভালবাসা কি কারো কেনা গোলাম যে ডাকলেই এসে হাজির হবে, আবার যা বললেই চলে যাবে ?

—তবে ?

—তোমাদের পুরুষদের বেলায় কি হয় জানি না। মেয়েরা যাকে একবার ভালবাসে তাকে কোন দিন ভুলতে পারে না।

—লাবণ্য তাহলে সাগরকে এমন ভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে কেন ?

—সেটা অভিমান। অনুভূতি যত গভীর অভিমান তত তীব্র। লাবণ্য বড় বেশী ভলবেসেছিলো তোমার বন্ধুকে, আজও বাসে। ভালবাসে বলেই তাকে সে ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলো। নইলে ভাবতে পারো, কিসের জোরে এই বিশাল পৃথিবীতে আজও সে একা দাঁড়িয়ে আছে ? কেন আজো সে বিয়ে করে নি ?

কথাটা আমারও অনেক সময় মনে হয়েছে। কিন্তু ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারি নি।

অভিমান কি এত সর্বগ্রাসী হতে পারে যে তার গহ্বরে দুটি মানুষের সুখ, আনন্দ, এমন কি জীবন পর্যন্ত তলিয়ে যেতে বসেছে, তবু তার অবসান নেই ?

মিনতির কথায় যেন নতুন করে সমস্যাটা দেখতে পেলাম।

সাগর মুখে যাই বলুক ওর মনের কথা তা নয়। লাবণ্যরও তাই। অভিমানের ঠুলি চোখে এঁটে বৃথাই ওরা ঘুরে মরছে জীবনের পথে। না পারছে একজন আর এক জনের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে, না পারছে কাছে আসতে। ব্যর্থ জীবনের অলাত চক্রে ঘুরে ঘুরেই যে

একদিন ওদের জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে সেটা বুঝবার মত সত্য পর্যন্ত আজ ওরা হারিয়ে ফেলেছে।

তাই স্থির করলাম, ওদের দুজনের জীবনের গতি-পথকে ঘুরিয়ে দেবার শেষ চেষ্টা আমাকে করতে হবেই।

নইলে কিসের বন্ধু আমি ?

সাগর যাই মনে করুক, ওর এই মারাত্মক অসুখের খবর লাবণ্যকে আমি জানাবই।

সাগর যতই অপমান বোধ করুক, লাবণ্যর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে চিঠি আমি লিখবই।

ঠুন্‌কো মান-অভিমান, সম্মান-অসম্মানের চেয়ে জীবন অনেক বড়।

ভগবান না করুন, অর্থাভাবে সুচিকিৎসার অভাবে সাগর যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে সে দিন নিজেকে আমি ক্ষমা করব কেমন করে ?

আর লাবণ্য যদি তারপরে কোন দিন এসে প্রশ্ন করে, সব জেনেও কেন সব খবর তাকে জানাই নি, কেন তার এত বড় সর্বনাশ আমি ঘটতে দিয়েছি একটা রুগ্ন হতাশ্বাস মানুষের কথায়, তাহলে তার কাছেই বা কী কৈফিয়ৎ দেব ?

তাই মিনতির পরামর্শ মতই সাগরের অসুখের সংবাদ জানিয়ে এবং তার চিকিৎসার জন্য সাধ্যমত কিছু অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে লাবণ্যকে তার স্কুলের ঠিকানায় চিঠি লিখে দিলাম একদিন।

আজ ভাবি, ভাগ্যিস চিঠিখানা সেদিন লিখেছিলাম !

ভাগ্যিস সাগরের অভিমানক্ষুব্ধ মনের চেয়ে তার জীবনটাকে সেদিন অনেক বড় করে দেখতে পেরেছিলাম। নইলে আমার ক্ষীণ সামর্থ্য দিয়ে যাদবপুর হাসপাতাল থেকে একদিন সাগরকে সুস্থ শরীরে আমার বাসায় ফিরিয়ে আনতে পারলেও তাকে নতুন জীবনে তো প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম না কোন মতেই।

সাগরকে তো আমি চিনি। একটু সুস্থ হলেই নিজেকে আমার গলগ্রহ মনে করে সকলের অজ্ঞাতেই আবার একদিন ও সরে পড়ত।

না নিজের জীবনের প্রতি মমতা, না আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ, কিছুই ওর যাযাবর মনকে ধরে রাখতে পারত না।

প্রাণতোষবাবুর স্নেহ ওকে ধরে রাখতে পারে নি।

ছাত্র-জীবনের বিরাট সাফল্যের সম্ভাবনা পারে নি ওর গতি রোধ করতে।

সদাশিববাবুও পারেন নি।

একদিন লাবণ্যও বুঝি পারে নি ওর বিহঙ্গ-মনের পায়ে শিকল বাঁধতে।

তবু একদিন ওর সমস্ত অন্তর একমাত্র যার হাতে ধরা দেবার জন্য একান্ত আগ্রহে উন্মুখ হয়ে উঠলো—সে লাবণ্য।

অথচ উগ্র অভিমানে ভ্রান্ত-দৃষ্টি লাবণ্য হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে নিলো না কাছে।

তাই তো দুঃখে, ক্ষোভে, হতাশায় জীবনটা ওর কাছে একেবারেই অর্থহীন হয়ে উঠলো। লাবণ্যর কাছ থেকে আঘাত খেয়ে যে-আঘাত তাকে ফিরিয়ে দিতে পারলো না, নির্মম হাতে সে-আঘাত হানলো সে নিজেরই বুকে। চরম উচ্ছৃঙ্খলতায় ও ঔদাসিন্যে জীবনকে সে তিলে তিলে ক্ষয় করে ফেললো।

তাই তো সেই লাবণ্যই আবার এক দিন ওকে হাত ধরে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলো জীবনের সোনার আঙিনায়।

ঝড়ের কালো মেঘে ঢাকা নভ-অঙ্গণ ছেড়ে দুরন্ত বিহঙ্গ ডানা মেলে বসেছিলো শান্ত নীড়ের স্নেহচ্ছায়ায়।

তাই তো আজ যখনই লাবণ্য ও সাগরের কথা ভাবি, অনেক দূরে থেকেও তখন মন আমার আত্মপ্রসাদে ভরে ওঠে।

আহা! ভাগ্যিস সেদিন লাবণ্যকে চিঠিখানা লিখেছিলাম।

অবশ্য সে-কাহিনী এক দিন আমাকে বলেছিলো লাবণ্য নিজেই। সাগর নয়।

সেই আশ্চর্য কাহিনীই বলছি এবার।

|| ১৭ ||

রাজগির।

প্রাচীন রাজগৃহ। গিরিব্রজপুরম্।

পঞ্চ পর্বতবেষ্টিত মনোরম উপত্যকা।

মহারাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজধানী।

ভগবান বুদ্ধের পাদস্পর্শে ধন্য।

সেই সপ্তপর্ণী গুহা, সেই পিপ্পিলা গুহা, সেই বেনুবন স্তূপ—প্রাচীন গিরিব্রজপুরের অনেক গৌরব-গাথার নীরব সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুঘু-ডাকা এক শান্ত প্রভাতে গৃধ্রকূট পাহাড়ের সংকীর্ণ পার্বত্য পথ বেয়ে সমতলে নেমে এলেন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

এক হাতে দণ্ড। এক হাতে ভিক্ষাপাত্র। পরিধানে গেরুয়া আলখাল্লা।

বৃদ্ধ বয়সেও সন্ন্যাসীর দেহ সক্ষম। মাথার চুল সব সাদা। আবক্ষলম্বিত শ্বেতশশ্রু। কিন্তু বার্ধক্যের ভারে অবনত হয় নি দেহ। উন্নত ঋজু দেহে নিশ্চিত পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চললেন লোকালয়ের দিকে।

সপ্তধারা পার হয়ে বেনুবন স্তূপ ছাড়িয়েই ডাইনে একটা ছোট জটলা সন্ন্যাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

একবার আকাশে চোখ মেলে দেখলেন বেলা খুব বেশী হয় নি। মাধুকরীর সময় এখনো যথেষ্ট হাতে আছে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন জটলার দিকে।

সন্ন্যাসী এ অঞ্চলে সুপরিচিত। সবাই সসম্ভ্রমে তাঁকে পথ ছেড়ে দিলো।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক হ্যাণ্ড-ব্যাগের উপর ন্যস্ত করতলে মাথা রেখে পথের ধারে ঘাসের উপরেই কম্বল বিছিয়ে অর্ধ শায়িত অবস্থায় চোখ বুঁজে পড়ে আছেন।

দেখেই মনে হলো, লোকটি অসুস্থ।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন। একটু যেন ধুঁকছেন।

ভদ্রলোকের পোষাক-পরিচ্ছদে দীর্ঘ পথপরিব্রাজনের চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

সন্ন্যাসী এগিয়ে যেয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

চোখ খুললেন ভদ্রলোক। মৃদু কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, কাল রাত থেকেই শরীরটা কেমন যেন বেঁকে বসেছে।

—আপনি যাবেন কোথায়? এসেছেনই বা কোথা থেকে?

সন্ন্যাসী ততক্ষণে ভদ্রলোকের একেবারে পাশে যেয়ে উপুড় হয়ে বসে পড়েছেন।

—আজ্ঞে, এসেছি অনেক দূর থেকে। যাব ওই সামনের জাপানী মন্দিরটায়। সেখানকার স্বামীজি আমার পরিচিত।

—তাহলে সেখানে না যেয়ে এই গাছতলায় শুয়ে আছেন কেন?

—ওখানে গিয়েছিলাম। আজ দুদিন স্বামীজি মন্দিরে নেই। অথচ আমারও শরীরের যে হাল, আর এক পাও চলতে পারছি না। তাই—

একটু বা অসহায় দৃষ্টিতে ভদ্রলোক তাকালেন সন্ন্যাসীর দিকে।

সন্ন্যাসী তাঁর কপালে হাত দিয়েই বলে উঠলেন, এঃ, আপনার জ্বরটা যে একটু বেশীই মনে হচ্ছে।

উঃ বলে ভদ্রলোক ডান হাতটা দিয়ে চোখ দুটো ঢাকলেন।

সন্ন্যাসীর স্নেহ-দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করবার জন্য কি না কে জানে।

লাবণ্যর গল্প শুনতে শুনতে আমার মনটাও বুঝি কিছুক্ষণের জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিলো প্রকৃতির অপূর্ব লীলা-নিকেতন রাজগিরের পাহাড়ের ছায়ায় ঘেরা শীতল কোলে।

কান পেতে যেন শুনতে পাচ্ছিলাম সাতধারার ঝর্ ঝর্ শব্দ আর নানা বিচিত্র কীট-পতঙ্গের অপূর্ব ঐক্যতান।

চমক ভেঙে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু এ কাহিনীর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? আপনি তো কোন দিন রাজগিরে যানও নি?

—কে বলেছে আপনাকে যে যাই নি? রাজগির যদি না যেতাম তাহলে আপনার এই কলকাতার বাসার পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে আসত কে?

অবাক বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়েছিলাম লাবণ্যর মুখের দিকে।

আমার সেই না-বলা প্রশ্নের জবাবেই লাবণ্য সেদিন আমাকে শুনিয়েছিলো সব কথা।

হঠাৎ একদিন স্কুলের ঠিকানায় তার নামে একটি টেলিগ্রাম এলো: লাবণ্যর বাবা মৃত্যু-শয্যায়। সে যেন অবিলম্বে রাজগিরের জাপানী মন্দিরে চলে আসে।

সদাশিববাবু তখন এক তীর্থ হতে আর এক তীর্থে, স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন উদ্দেশ্যহীন পথিকের মত।

মাঝে মাঝে টাকার দরকার হলেই লাবণ্যকে তিনি ঠিকানা জানিয়ে একখানি চিঠি লিখতেন। টাকা এসে গেলেই আবার উধাও হয়ে যেতেন কিছু দিনের মত।

প্রথম প্রথম লাবণ্যর ভারী দুশ্চিন্তা হতো বাবার জন্য।

অনেক অনুরোধ-উপরোধও জানিয়েছে অন্তত নিয়মিতভাবে চিঠি লিখে নিজের খবর জানাবার জন্য।

কিন্তু সদাশিববাবু স্মিত হাসিতে সে অনুরোধ উপেক্ষা করে নিজের খুশি মতই চলেছেন।

ক্রমে সবই লাবণ্যর গা-সওয়া হয়ে গেছে।

চিঠি পেলেই ডাক ঘরে সঞ্চিত অর্থ থেকে কিছু টাকা তুলে বাবাকে পাঠিয়ে দেয়। তারপর আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাঁর আর একখানি চিঠির জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

তেমনি এক অপেক্ষার অবসরেই এলো টেলিগ্রাম।

স্কুলের সেক্রেটারীকে টেলিগ্রাম দেখিয়ে কিছু দিনের ছুটি নিয়ে সেই দিনই লাবণ্য রাজগিরের ট্রেনে চেপে বসলো।

স্টেশনেই তাকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করলেন এক বৃদ্ধ সৌম্য সন্ন্যাসী।

কথার মাঝখানে হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লাবণ্য বললো, একটি বার মাত্র তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সেদিন আমার মনে হয়েছিলো তিনি আমার পরমাত্মীয়। আচ্ছা বলুন তো, এ কেমন করে হয়?

বললাম, কেমন করে হয় তা জানি না। তবে হয় এটা আমিও দেখছি। কিন্তু সন্ন্যাসীটি কে তা তো বললেন না?

—আমার বাবা।

—আপনার বাবা? সবিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

মৃদু হেসে লাবণ্য বললো, আমার বাবার বন্ধু। আমারও পিতৃ-স্থানীয়। কিন্তু এতক্ষণে আপনার তো তাঁকে চিনতে পারা উচিত ছিলো। খবরের কাগজের লোক আপনারা—

সলজ্জ হেসে বললাম, ঠিকই বলেছেন। সাগরের বাবাকে এতক্ষণ আমার চেনা উচিত ছিলো। কিন্তু কী আশ্চর্য যোগাযোগ বলুন তো?

উদাস কণ্ঠে লাবণ্য বললো, পৃথিবীটাই যে এক পরম আশ্চর্যের মেলা, সারাটা জীবন ভরে এই তো দেখে এলাম। রাতের অন্ধকারে যেদিন আপনার বন্ধু আমাকে পর্যন্ত ছেড়ে চলে গিয়েছিলো সে

আশ্চর্যের কোন তলই সেদিন খুঁজে পাই নি। আবার কাছে পেয়েও যেদিন আমি নিজে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, আমার সেই আশ্চর্য মনের কোন কিনারাও তেমনি পাই নি সেদিন। আর আজ যে আপনার কলকাতার বাসায় বসে এমন সহজ মন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে পারব তাই কি কোন দিন ভাবতে পেরেছিলাম জীবনে?

নিজের দার্শনিক উপলব্ধিতে মগ্ন হয়েই লাবণ্য চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলো।

জাপানী মন্দির স্টেশনের খুব কাছেই।

সেখানে পৌঁছে সে দেখতে পেলো, সদাশিববাবুর অবস্থা খুব খারাপ। দুটি নিষ্প্রভ চোখ কোটরগত। কপালের দুটো পাশ বসে গিয়ে নীল মোটা শিরা দুটো প্রকট হয়ে উঠেছে।

লাবণ্য বিছানার পাশে বসে বাবার কপালে হাত দিয়ে ডাকলো, বাবা!

চোখ খুললেন সদাশিববাবু।

অস্পষ্ট সজল দৃষ্টি।

তবু চোখ দুটো যেন আকস্মিক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

অনেক কষ্টে ডান হাতখানি তুলে ওর চিবুক স্পর্শ করলেন।

দুটি চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

সন্ন্যাসী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইঙ্গিতে তাঁকে প্রণাম করতে বললেন।

লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম করলো।

আরো একদিন তাঁকে একটি প্রণাম করবার তীব্র ইচ্ছা জেগেছিলো লাবণ্যর মনে।

অশৌচ বলে সেদিন তাঁকে সে প্রণাম করতে পারে নি।

গভীর শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অপলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়েছিলো তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ-দুটি চোখের দিকে।

রাজগিরেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন সদাশিববাবু।

তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে জাপানী মন্দিরেই ফিরে এলো লাবণ্য।

সায়া পাহাড়টার গায়ে মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে সূর্য তখন অস্তোন্মুখ।

জাপানী মন্দিরের দোতলায় দাঁড়িয়ে সেই দিকেই চেয়ে ছিলো লাবণ্য। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ও টেরও পায় নি।

মৃদু কণ্ঠে তিনি বললেন, দুঃখ করে আর কি করবে মা! বাবা কি কারো চিরকাল বেঁচে থাকে!

চমকে ফিরে দাঁড়ালো লাবণ্য। বললো, আপনি?

—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মা।

—বলুন।

—শেষ সময়ে তোমার বাবা টাকার কথা কি বলেছিলেন না?

অবাক হয়ে সন্ন্যাসীর দিকে তাকালো লাবণ্য। সর্বত্যাগী গুহাবাসী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। নিত্য মাধুকরী তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। স্বল্প-পরিচিত একটি সত্তমৃত মানুষের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে তাঁর মনে এ অহেতুক কৌতূহল কেন!

নিজের বিস্ময় গোপন করে লাবণ্য সহজ ভাবেই জবাব দিলো, আজ্ঞে, ডাকঘরে বাবার কিছু টাকা আছে আমার নামে।

—দেখো মা, তুমি হয়তো খুব অবাক হয়েছ আমার এই কৌতূহল দেখে। কিন্তু এই টাকার প্রসঙ্গে তোমার বাবা এমন একটি নাম উচ্চারণ করেছেন যাতে আমার তীব্র কৌতূহলকে আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারছি না।

অধিকতর বিস্ময়ে লাবণ্য তাকালো তাঁর দিকে।

দুটি বার্ধক্যজীর্ণ চোখ কিসের যেন প্রত্যাশায় থর্ থর্ করে কাঁপছে। কোন্ সাত রাজার ধন মানিক যেন ধরি-ধরি করেও ধরতে পারছেন না তিনি।

লাবণ্য কোন কথা বললো না। তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে রইলো।

সন্ন্যাসী সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, সাগর কে মা? তার পুরো নাম কি?

জবাব দিতে একটু যেন ইতস্তত করলো লাবণ্য।

তারপর বললো, বাবা তাকে খুব স্নেহ করতেন। আমাদের বাড়িতে থেকেই এক সময় তিনি কলেজে পড়তেন। আমাকেও পড়াতেন।

—তার পুরো নাম কি?

—সমুদ্র কৃষ্ণ সেন।

—সাগর!

অকূল সমুদ্রে যেন কূল পেলেন সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী।

জীবন-বৈতরনীর সন্ধান কি মিললো এত দিনে!

—সে এখন কোথায় বলতে পারো?

—তা তো জানি না।

—কিন্তু তোমার বাবার সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক তিনি তাকেই দিতে বললেন যে তোমাকে?

—হ্যাঁ, যদি কখনো তার দেখা পাই তবে।

—কিন্তু তোমাদের ছেড়ে, তোমার বাবার এমন অপার্থিব স্নেহকে আঘাত করে সে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেলো কেন বলতে পারো মা?

একটু চুপ করে থেকে লাবণ্য বললো, সে অনেক কথা। সে সব কথা আজ আপনাকে আমি বলতে পারছি না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

—থাক্ মা, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি জানি, ওর স্বভাবই ওই। কারো কোন স্নেহ-ভালবাসাই ওকে বাঁধতে পারে না।

সচকিতে মুখ তুলে লাবণ্য বললো, আপনি জানেন? আপনি চেনেন নাকি তাকে?

—চিনি মা, খুব চিনি। চিনি বলেই তো আজ আমার এই দশা। সেই লক্ষ্মীছাড়া যে এই বুড়োকেও বাবা বলে ডাকত। অথচ যেদিন

আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলো সেদিন সে একবারও ভাবলো না যে ওকে ছেড়ে আমি বাঁচব কেমন করে। ওর স্বভাবই ওই। কিন্তু মা, আমি শুধু ভাবছি এ বুড়োকে না হয় সে ভুল বুঝে চলে গেলো, কিন্তু এমন লক্ষ্মী প্রতিমাকে সে ছেড়ে গেল কোন্ দুর্দৈবের টানে?

লাবণ্যর মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আর্ত স্বর বেরিয়ে এলো, বাবা!

—হ্যাঁ মা, এই বুড়োও তোর বাবা। আমি যত দিন বেঁচে আছি তোর কোন ভয় নেই মা, কোন ভাবনা নেই।

লাবণ্যর তখন বড় ইচ্ছা হয়েছিলো প্রাণতোষবাবুর দুটো পায়ের উপর মাথা রেখে জীবনের সব বোঝা সেখানে নামিয়ে দেয়।

অশৌচ বলেই তখন প্রণাম করতে পারে নি।

গভীর শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অপলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে ছিলো তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ দুটি চোখের দিকে।

॥ ১৮ ॥

রাজগিরের জাপানী মন্দিরে আরো একটি দিন কাটিয়ে লাবণ্য প্রাণতোষবাবুকে বললো, এবার তাহলে আমার ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিন বাবা। স্বামীজির উপর আর কত অত্যাচার করব?

প্রাণতোষবাবু বললেন, সেই ব্যবস্থাই তো করছি। কিন্তু আরও দু একদিন যে দেরি হবে মা।

—কেন?

—শুধু তো তোমার যাবার ব্যবস্থা করে দিলেই হবে না। আমার নিজেরও যে কিছু বিধি-ব্যবস্থা করতে হবে।

—আপনার—মানে—

—আমিও যে তোমার সঙ্গেই যাব মা।

—আপনিও যাবেন আমার সঙ্গে?

এই গভীর বিপদেও যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো লাবণ্যর স্বর।

—যেতেই যে হবে মা। নইলে সে হতভাগাটার খোঁজ তো তুমি একা করে উঠতে পারবে না। এতদিন তার আশা ছেড়ে দিয়েই এই পাহাড়ে পড়ে ছিলাম। কিন্তু আজ যখন তোমাকে পেয়েছি, তখন আমার মন বলছে তাকেও পাব। আমাকে সে ভুলে থাকতে পারে, কিন্তু তোমার সুতোর টানে সে হতভাগাকে একদিন না একদিন ফিরে আসতেই হবে, এ তুমি দেখে নিও মা।

লাবণ্যর শোকম্লান মুখখানি মুহূর্তের জন্য লজ্জারুণ হয়ে উঠলো।

কিন্তু পরমুহূর্তেই অভিমানের কালো মেঘ বুঝি নেমে এলো সে মুখে। চাপা গলায় লাবণ্য বললো, কিন্তু বাবা—

বিস্মিতে দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন প্রাণতোষবাবু। একটা অস্থির চাঞ্চল্যে লাবণ্যর ঠোঁট ছুটি কাঁপছে। কি যেন বলতে যেয়েও ও বলতে পারছে না।

প্রাণতোষবাবু বললেন, তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে অবশ্য—

তাঁকে কথা শেষ করতে দিলো না লাবণ্য। চমকে চোখ তুলে বললো, না না, আপত্তি থাকবে কেন? আপনি চলুন আমার সঙ্গে।

প্রাণতোষবাবু তবু একটু ইতস্তত করছেন দেখে লাবণ্য বললো, আমার সব কথা আজ আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না। কিন্তু তার জন্যে আপনি যেন আমাকে ভুল বুঝবেন না বাবা।

প্রাণতোষবাবু লক্ষ্য করলেন, লাবণ্যর ছুটি চোখ অশ্রুতে টলমল করছে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, ছেলে-মেয়েকে ভুল বোঝার যে কত জ্বালা সে তো আমি জানি মা। না না, সে ভুল আমি আর করব না। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো মা।

গৃধ্রকূট আশ্রমের একটা সাময়িক ব্যবস্থা করে প্রাণতোষবাবু ছু তিন দিন পরেই লাবণ্যকে নিয়ে তার স্কুলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

আর সেখানে পৌঁছেই লাবণ্য পেলো আমার লেখা চিঠি।

চিঠি পড়ে মুহূর্তের জন্য যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো লাবণ্য।

কী তার কর্তব্য এখন? কোন্ পথে সে যাবে?

মনে পড়লো, বেলা বাগানের বাসায় যেদিন সাগরের সঙ্গে তার শেষ দেখা হয়েছিলো সেদিন সে বলেছিলো—'তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করেই থাকব। যদি কখনো তোমার সময় আসে, সেদিন যেন আমাকে ডাকতে ভুলো না।'

সেই ডাক কি আজ এমন ভাবেই এলো? একেবারে টি. বি. হাসপাতালের শয্যা থেকে?

মনে পড়লো, সেদিন লাবণ্য নিজেও সাগরকে বলেছিলো—'যাবার

আগে তুমি আমাকে আশীর্বাদ করে যাও, জীবনের সত্য পথ থেকে যেন কখনো বিচ্যুত না হই।'

কী সেই সত্য পথ? অভিমানকে আকড়ে ধরে আজও সাগরের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা? না মান-অভিমান সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারি কাছে উধাও হয়ে ধাওয়া? কী তার কর্তব্য? কোন্ পথে সে যাবে?

কাঁপা হাতে লাবণ্য চিঠিখানা এগিয়ে দিলো প্রাণতোষবাবুর দিকে। বললো, সর্বনাশ হয়েছে বাবা।

—সর্বনাশ! আঁতকে উঠলেন প্রাণতোষবাবু। বললেন, সর্বনাশ! তুমি বলছ কি মা?

—এই চিঠিখানা পড়ুন।

এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে ফেললেন প্রাণতোষবাবু। চুপ করে কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধরা গলায় বললেন অনেকটা যেন নিজেরই মনে, উঃ, শেষে এমনি করেই তুই আমাকে ঠকিয়ে যাবি! একটা ভুল না হয় করেই ফেলেছি। বুড়ো বাপ বলে কি তুই তা ক্ষমা করতে পারলি না।

প্রাণতোষবাবুর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

কথা বললো লাবণ্য, এখন আমি কি করব বাবা?

—সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা করতে হয় মা? আজই আমাদের কলকাতা যেতে হবে। ছুটি তো তোমার নেওয়াই আছে। তুমি এখুনি তৈরি হয়ে নাও।

অভিমানের বাঁধন বড় শক্ত। কেটেও যেন কাটতে চায় না।

লাবণ্য বললো, আমি বলছিলাম কি বাবা, আপনিই কলকাতা চলে যান। আমি আর নাই গেলাম। আমি বরং ডাকঘর থেকে কিছু টাকা তোলবার ব্যবস্থা করি গে।

—টাকা তো তোমাকে তুলতেই হবে। আমার অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখে এসেছ। নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা। আর উনি তো

ওদিকে রাজরোগ বাধিয়ে বসেছেন। কিন্তু মা, শুধু টাকা পাঠালেই তো হবে না। তোমাকে যে স্বয়ং যেতে হবে। নইলে তোমার টাকা যদি সে না নেয়। সে যে বড় অভিমানী। তাকে তো তুমি চেনো।

লাবণ্য এ কথার কোন জবাব দিলো না। মুখ নিচু করে চুপ করে রইলো।

—কিন্তু তুমি যেতে চাইছ না কেন মা? তোমার কি যাবার কোন অসুবিধা আছে?

—না বাবা, অসুবিধা আর কি? তবে—

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রাণতোষবাবু বললেন, বুঝেছি মা, অভিমানের বোঝাটা তুমি এখনো মন থেকে সরাতে পারছ না। কিন্তু মা, এই কি অভিমান করে দূরে সরে থাকবার সময়? সাগর যে মৃত্যুশয্যায়—

প্রাণতোষবাবুর গলার স্বর গভীর বেদনায় যেন থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। কি যেন ভাবলেন। তারপর আবার বললেন, কি জানো মা, সাগর আমার বড় অভিমানী। আর ওরই বা দোষ কি বলো? এইটুকু বয়সে সংসারের কাছ থেকে কম আঘাত তো ও পায় নি। শুধুই কি সংসার? বিধাতাপুরুষই যেন দুঃখের দীপ হাতে দিয়েই ওকে পাঠিয়েছিলেন এ পৃথিবীতে। নইলে ওর মত ছেলের এমন হাল হবে কেন? আমিই বা মুহূর্তের জন্য ওকে ভুল বুঝলাম কেন? আর ওই বা এত ভালবেসেও আমাকে এমন ভুল বুঝলো কেন? আর সেই ভুল বোঝাবুঝির আগুনে ওর সোনার জীবনই বা এমন করে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যাবে কেন? ও কেন ঘুরে বেড়াবে পথে পথে? ওর যে আজ রাজা হবার কথা মা।

বলতে বলতে প্রাণতোষবাবুর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। পরম বিস্ময়ে এই সন্ন্যাসীকল্প স্নেহময় মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলো লাবণ্য।

চকিতে তার মনে হলো, এ সে কী করেছে এতদিন, সংসারবিরাগী সর্বত্যাগী এক বৃদ্ধ যা পেরেছে সে কি না তাও পারে নি? একদিন যাকে ভালবেসে পুত্র বলে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, ভুলের বশে সে আজ দূরে চলে গেলেও তাকেই তিনি খুঁজে ফিরছেন সারাটা জীবন। আর আজ তাকে ফিরে পাবার এতটুকু সম্ভাবনার সূত্র হাতে পেয়ে পরম আশ্বাসে তাকেই আকড়ে ধরেছেন। আর সে কি না তার ভালবাসার মানুষকে কাছে পেয়েও শুধু অভিমান বশেই বার বার নির্মম ভাবে তাকে ফিরেয়ে দিয়েছে। ছিঃ ছিঃ, এ সে কী ভুল করেছে এত দিন।

মুখ তুলে ব্যগ্রকণ্ঠে সে বললো, ভুল যে আমিও তাকে অনেক বুঝেছি বাবা। আমাকে কি সে ক্ষমা করবে?

—করবে মা, নিশ্চয় করবে। আমি যখন এসে পড়েছি তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। কি জানো মা, ভুল তো মানুষই করে। আবার মানুষই একদিন সে ভুল ক্ষমা করে। নইলে পৃথিবী যে অচল হয়ে যেত মা।

লাবণ্য কোন কথা বললো না।

গভীর আশ্বাসে চোখ বুঁজলো।

এই ভরসা টুকু পাবার জন্যই তার মন যেন এত দিন কোন্ দূর নিভৃতে বসে হাহাকার করছিলো।

এবার তার মন বললো: তাই হোক। তাই হোক। তুমি এসো। ভুলের এই চোরাবালি থেকে আমাকে বাঁচাও। আমিও যে আর পারি না গো।

॥ ১৯ ॥

তারপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত।

সে কাহিনীও আমাকে শুনিয়েছিলো লাবণ্য।

যে কয়টি মানুষের কথা এতক্ষণ একটানা বলে এলাম তাদের জীবন-নাটকের মাত্র প্রথম কয়েকটি দৃশ্যের প্রত্যক্ষ দর্শক হ'লেও বাকি অধিকাংশ দৃশ্যেই আমার ভূমিকা একান্তভাবেই শ্রোতার। তার কতক বলেছে সাগর। আর বাকিটা বলেছে লাবণ্য।

এতকাল পর্যন্ত তাদের মুখে যখন যে কাহিনীই শুনেছি তার সবটাই অশ্রুসজল, বেদনাবিধুর। কিন্তু এবার লাবণ্যর মুখে যে কাহিনী শুনলাম তার ছত্রে ছত্রে আশ্বাসের, আনন্দের আভাষ। কথা বলতে বলতে লাবণ্যর চোখে-মুখে মাঝে মাঝেই খুশির যে ঝিলিক খেলেছে তা দেখে আমার মনও খুশিতে ভরে উঠেছে। ভাবতে ভারী ভাল লেগেছে যে, আমি ছিলাম বলেই ওদের মুখে এ হাসি ফুটতে পেরেছে।

মিনতি অবশ্য ঠেস্ দিয়ে বলেছে, কি গো, তখন বলেছিলাম না যে মেয়ে মানুষ একবার যাকে ভালবাসে তাকে জীবনে কোন দিন ভুলতে পারে না। তখন তো আমার কথা তুমি মানতেই চাইছিলে না। কেমন এখন হলো তো?

আমি মাথা কাৎ করে সবিনয়ে বলেছি, নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমার এ বাণী অক্ষয় হোক আমি নির্ভাবনায় রাত জেগে ডিউটি করি।

কৃত্রিম ক্রোধে দুচোখ কষায়িত করে মিনতি বলেছে, বটে! ইয়ার্কি হচ্ছে!

কিন্তু আমাদের কথা থাক। লাবণ্যর কাহিনীটাই শেষ করি এবার।

একদিন সকালে চার পাঁচখানা দৈনিক সংবাদ-পত্র সামনে খুলে রেখে গত রাতের নিজের সাংবাদিকতার আত্ম-সমালোচনায় মগ্ন হয়ে ছিলাম, এমন সময় ধূমায়িত চায়ের বাটি হাতে ঘরে ঢুকলো মিনতি।

বাটিটা আমার সামনে নামিয়ে রাখতে রাখতে সে বললো, সারা-রাত ওই ছাঁইপাশ ঘেঁটেও তোমার আশা মেটে না? আবার সকাল বেলায়ই বসেছ ওই জঞ্জাল ঘাটতে?

গরম চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, কি জানো, ওটা হলো শূকর-বৃত্তি। জঞ্জাল না ঘাটলে মনের গায়ে সুরসুরিটা ঠিক মত লাগে না।

এমন সময় বাইরের কড়াটা আস্তে আস্তে নড়ে উঠলো।

আমাকে ডাকতে এসে দরজার কড়া যারা নাড়ে তাদের প্রায় সবারই যেন উদ্দেশ্য থাকে দরজার কড়াটাকে ভেঙে ফেলা, আমাকে ডাকা নয়। কিন্তু এতো সে রকম নয়। কেমন ধীর মন্থর বিলম্বিত লয়ে কে যেন কড়া নাড়ছে।

আমার উঠে যেয়ে দরজা খুলতে বোধ হয় একটু বেশী দেরীই হয়েছিলো। কানে এলো সংযত নিচু কণ্ঠস্বর: তরুণ কুমার রায় এ বাড়িতে থাকেন?

দরজা খুলেই দেখি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। পিছনে একটি মহিলা। চকিতে মনে হলো, তবে কি এঁরা সদাশিববাবু আর লাবণ্য!

বৃদ্ধ আবার বললেন, তরুণ কুমার রায় এ বাড়িতে থাকেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি।

—তুমি তরুণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনি?

—আমাকে চিনতে পারলে না? আমি তোমার মাস্টারমশাই। প্রাণতোষ—

—আর বলতে হবে না স্যার। আমি চিনতে পেরেছি।

তাড়াতাড়ি ভূমিষ্ট হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে উঠলাম, কী আশ্চর্য স্যার! এতদিন পরে হঠাৎ আপনি এলেন আমার বাড়িতে। কিন্তু ঠিকানা পেলেন কেমন করে স্যার?

—কেন? ঠিকানা পেলাম আমার মার কাছে।

—আপনার মা?

—হ্যাঁ, এই তো আমার মা। লাবণ্য।

দুই হাত জোড় করে বললাম, আপনি! আসুন, আসুন। কী অধীর ভাবেই যে আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে আছি সে আর কী বলব। মিনু, মিনু, শিগ্‌গির এসো। দেখো কারা এসেছেন!

আমাদের কথা শুনে মিনতি নিজেই এগিয়ে এসেছিলো। সবাইকে নিয়ে ঘরের ভিতরে যেয়ে বসলাম।

একে একে সাগরের অনেক কথাই খুলে বললাম। সে যে এখন ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠছে সে কথাও জানালাম।

প্রাণতোষবাবু যেন খুশিতে একেবারে গদগদ হয়ে উঠলেন।

লাবণ্যর দিকে চেয়ে বললেন, কি গো মা, বলেছিলাম না যে আমি যখন এসে পড়েছি তখন সব ঠিক হয়ে যাবে?

লাবণ্য কোন জবাব দিলো না। মৃদু হেসে মুখ নিচু করলো।

কথা বললাম আমি, সত্যি স্যার, সে হতভাগাটা যে আপনাদের সবাইকে এখানে এমন ভাবে টেনে আনতে পারবে এ যেন আমি ভাবতেও পারি নি। কিন্তু আমি সব চেয়ে আশ্চর্য হচ্ছি, আপনার সঙ্গে লাবণ্য দেবীর পরিচয় হলো কেমন করে?

প্রাণতোষবাবু বললেন, সবই সেই অঘটনঘটন পটিয়সীর লীলা বাবা। এক সঙ্গে যখন জুটে পড়েছি, তখন সবই জানতে পারবে। আমার এই মার কাছেই শুনতে পারবে একদিন।

লাবণ্যই একদিন বললো সব ঘটনা।

সেই দিন সন্ধ্যায়ই খুশি মনে সবাই ফিরেছি যাদবপুর হাসপাতাল থেকে।

সাগরের সদ্য-তোলা এক্স-রে প্লেটটা দেখিয়ে ডাক্তারবাবু হেসে বলেছেন, আর কোন ভয় নেই মিঃ রয়। স্পটটা একেবারে মিলিয়ে গেছে। শিগগিরই ওকে আমরা ছেড়ে দেব এখান থেকে। তারপর কম্‌প্লিট রেষ্ট অ্যাণ্ড নিউট্রিশন। ব্যাস্‌, এভরিথিং উইল বি ও. কে.।

আমাদের ছোট বাড়ির ছোট ছাদটায় তিনজন বসেছি মাদুর বিছিয়ে।

প্রাণতোষবাবু গিয়েছেন দক্ষিনেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে। সাগরের কল্যাণ কামনা করে মায়ের পায়ে প্রণাম জানাতে।

আকাশে উঠেছে শুক্লা পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ।

আমার ও মিনতির অনুরোধে লাবণ্য একে একে বলতে লাগলো সব কথা। কখনো বেদনায় গম্ভীর শোনালো ওর কণ্ঠস্বর। কখনো বা কণ্ঠে ঝরে পড়লো খুশির ঝরণা।

তারপর এক সময় ডুবে গেলো শুক্লা পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ।

আকাশে ছড়িয়ে রইলো আলো-আঁধারির আবছায়া রহস্য।

আর তখনই লাবণ্যর কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়লো সুরের ঝরণা। নিজের খুশিতেই ও গান গেয়ে উঠলো মৃদু গলায়:

'আমার এ-আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে।'

আরো অনেক দিন পরে একখানি চিঠি পেলাম।

গৃধ্রকূট থেকে।

প্রাণতোষবাবু লিখেছেন:

বাবা তরুণ, এ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে লাবণ্য ও সাগরের শুভ বিবাহ হইবে। উহাদের নিমন্ত্রণ-পত্র তুমি অবশ্যই পাইয়া

থাকিবে। তবু উহারা আমাকে লিখিয়াছে, উক্ত শুভদিনে তোমাকে যোগদানের কথা লিখিতে। বোধ করি, উহারা মনে করিয়াছে, কাজের অজুহাতে উহাদের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেও বৃদ্ধ মাস্টারমশায়ের অনুরোধ তুমি ঠেলিতে পারিবে না। এই উপলক্ষ্যে গৃধ্রকূট পাহাড়ের বন্য গুহা ছাড়িয়া আমাকেও কয়েক দিনের জন্য সেখানে অবশ্য যাইতে হইবে। সে সময় তোমাকেও কাছে পাইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হইবে। আশা করি তুমি আমাদিগকে নিরাশ করিবে না।